পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬২ বর্ষ ❑ ৩য় সংখ্যা

১৫ আগষ্ট, ১৯৯৯ ঈসাব্দ

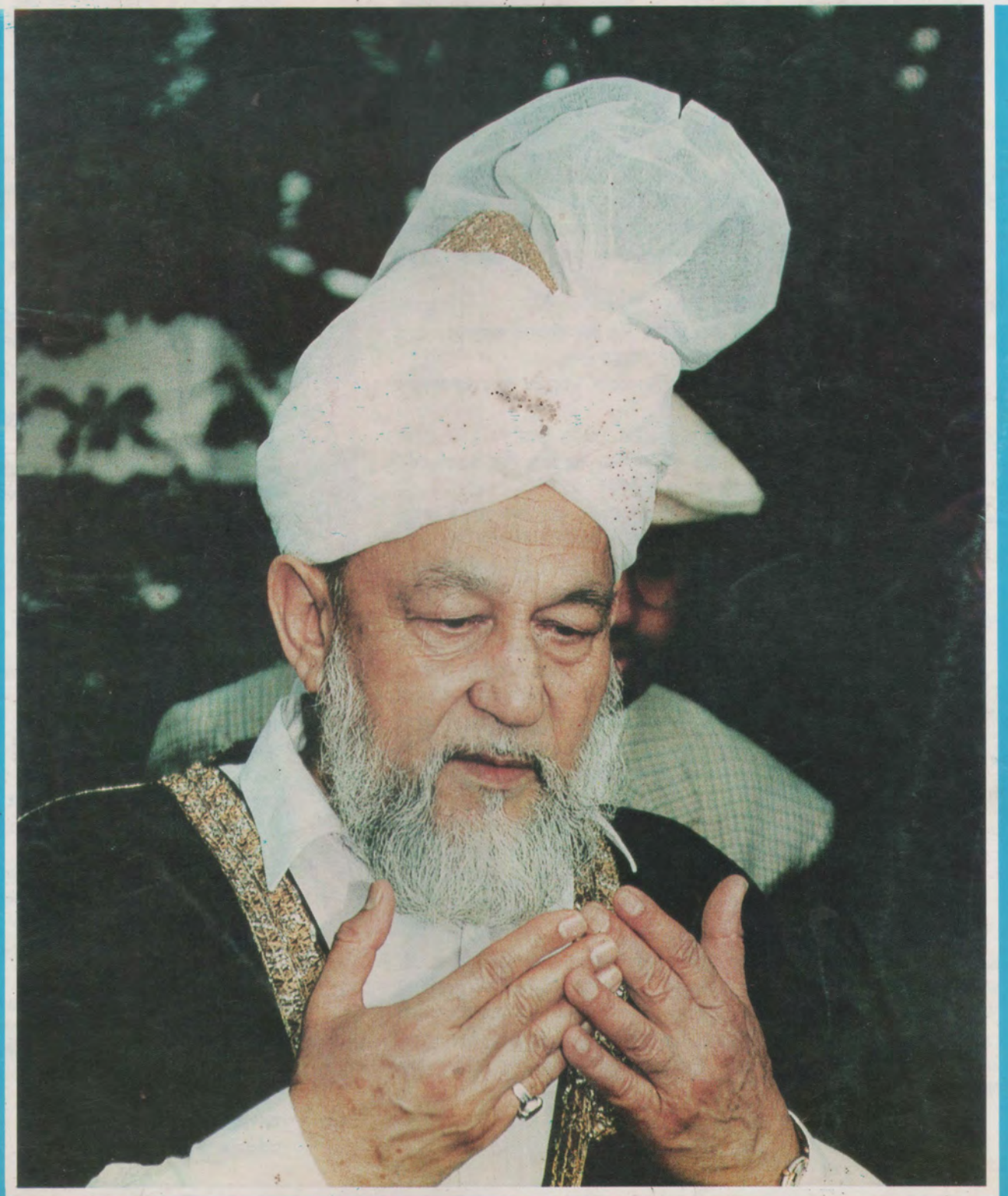

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

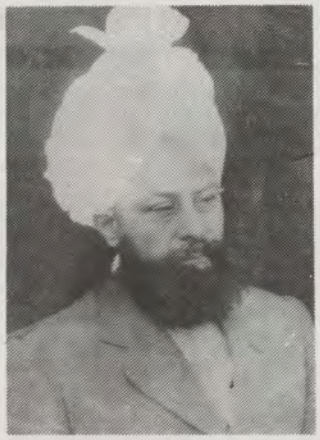

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের ঊর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

এখন তা'লীম তরবীয়তে মনোযোগ দিন

প্রাকৃতিক নিয়ম ইহাই যে, উন্নতির সাথে সাথে অবনতির এবং আনন্দের সাথে দুঃখের একটি উপকরণ সৃষ্টি হয়েই থাকে। এ দিকে লক্ষ্য রেখেই কুরআন করীমের সূরা 'নাসর'-এ আল্লাহ্তাআলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তাঁর উম্মত তথা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন-যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসবে আর তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো; নিশ্চয় তিনি পুনঃ পুনঃ তওবা গ্রহণকারী।

যখন মু'মিনদের বিজয় আসে তখন তাদেরকে কোন প্রকার শিরক না করে যেমন একদিকে কেবল আল্লাহ্রই প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তেমনি মু'মিন সমাজ যাতে কলুষিত না হয় সেজন্যেও প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে ইস্তেগফার ও ক্ষমা প্রার্থনার ব্যবস্থা-পত্র দেয়া হয়েছে। একথা বলা বাহুল্য যে, নবাগতরা বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধি রূপ বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা নিয়ে প্রবেশ করে থাকে তাই তাদেরকে নির্মল ও পরিশুদ্ধ করার প্রক্রিয়া হিসেবে একদিকে ইহা যেমন একটি ব্যবস্থা-পত্র তেমনি পুরাতনরা যাতে নবাগত কর্তৃক বাহিত পূর্ববর্তী দূষিত ধ্যান-ধারণা ও আকিদা-বিশ্বাস দ্বারা আক্রান্ত না হতে পারে সেজন্যে ইহা একটি প্রতিষেধক তুল্য ব্যবস্থা-পত্র। এ ব্যবস্থাপত্র যেমন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে প্রযোজ্য ছিলো তেমনি আজও এ ব্যবস্থাপত্রকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। এ বছর বাংলাদেশে অতীতের যে কোন সময়ের রেকর্ড ভঙ্গ করে নাবাগতদের আগমন ঘটেছে। এমতাবস্থায় আমাদের জামাতের তা'লীম ও তরবীয়তের মানকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে আমাদেরকে উপরোক্ত কুরআনী ব্যবস্থা-পত্র প্রয়োগ করতে হবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-ও তাঁর লন্ডন জলসার ভাষণে এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সুতরাং বাংলাদেশের সমস্ত আহমদীকে একদিকে যেমন তসবীহ্, তাহলীল ও ইস্তেগফার পড়ার দিকে মনোযোগী হতে হবে। অন্যদিকে নবাগতদেরসহ নিজেদের তা'লীম ও তরবীয়তের বিভিন্ন প্রক্রিয়াদি অবলম্বন করে তা'লীম ও তরবীয়তের মানকে সমুন্নত রাখার জন্যে জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে এর তৌফীক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬২ বর্ষ ॥ ৩য় সংখ্যা

৩১ শ্রাবণ ১৪০৬ বঙ্গাব্দ ২ জমাঃ সানী ১৪২০ হিঃ কাঃ
১৫ যহুর ১৩৭৮ হিঃ শাঃ ১৫ আগষ্ট ১৯৯৯ ইসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

সম্পাদক
মকবুল আহমদ খান

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক

সহকারী হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	–	হংকং
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৩৪১৪

সম্পাদকীয়

ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের মিছিল এগিয়ে চলেছে!

আল্লাহ্‌তাআলার নিকট একমাত্র ধর্মই হলো ইসলাম। যদিও হযরত আদম আলায়হেস সালাম থেকে ইসলামেরা শুভ সূচনা ও অগ্রযাত্রা আরম্ভ হয়েছিলো, কিন্তু এর পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ পেয়েছে বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমে। ইতঃপূর্বে আল্লাহ্‌তাআলার তৌহীদ বা একত্ববাদই ইসলাম নামে পরিচিত ছিলো। হযরত নবী করীম (সঃ) -এর পূর্বে কোন নবীই পরিপূর্ণ শিক্ষা ও পরিপূর্ণ আদর্শসহ আগমন করেন নি। আল্লাহ্‌তাআলা নবী করীম (সঃ)-কে পরিপূর্ণ শিক্ষা কুরআন মজীদ ও তাঁকে পরিপূর্ণ আদর্শ নবী করে প্রেরণ করেন। আর তাই আল্লাহ্‌তাআলার নামের সাথে 'রসূলুল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌র রসূল সংযোজিত হয়ে গঠিত হয়েছে কলেমা বা কলেমাতুত্তাওহীদ-আল্লাহ্‌র একত্ববাদের কথা। সারা দুনিয়ায় এই কলেমার প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্যেই আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন বিশ্ব-জগতে বিশ্ব-নবীর মর্যাদা দিয়ে।

কুরআন করীম পাঠে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের প্রিয় নবীর দু'টি আবির্ভাব-একটি উম্মীইনদের মধ্যে (সূরা বাকারা ঃ ১৩) এবং অপরটি অন্যদের মধ্যে শেষ যুগে (সূরা জুমুআ ঃ ৩)। প্রথম আবির্ভাব তাঁর (সঃ) মুহাম্মদ নামের তেজবীর্য-গৌরব প্রভা বিকশিত হয়ে ইসলামের ভিত্তি সুদূরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ইসলাম রবির তেজোদীপ্ত প্রভা একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কতিপয় ধর্মের ওপরে স্বীয় প্রভাবকে বিস্তার করে দুনিয়াকে মোহিত করে। কিন্তু এর সামগ্রিক প্রভা বিশ্বের সব ধর্মের ওপরে এর প্রাধান্যের ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছিলো (সূরা সাফ্‌ফ ঃ ১০) যা কিনা ঐ সময় সাধিত হয় নি। ইহা তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাব-মসীহ্ ও মাহ্‌দী হিসেবে তাঁর আধ্যাত্মিক আবির্ভাবের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মতভেদের কোন অবকাশ আছে বলে আমরা মনে করি না। সূরা সাফ্‌ফের ১০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুফাসসেরীন একথা ব্যক্ত করেছেন যে, এ আয়াতে উল্লেখিত ইসলামের সব ধর্মের ওপরে প্রাধান্য লাভ হবে-'ইনদা খুরুজিল মাহ্‌দী'অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে।

যথাসময়ে ঐশী প্রতিশ্রুতি মুতাবেক (বুখারী কিতাবুত্ তফসীর)মাহদী হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আবির্ভূত হয়েছেন সালমান ফারসী নামক বিখ্যাত সাহাবী (রাঃ)-এর বংশে। তাঁর (আঃ) মাধ্যমে ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামে পুনরায় খিলাফতে আলা মিনহাজিন নবুওয়ত অর্থাৎ নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঐশী কর্মসূচী অনুযায়ী ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের কর্মকান্ড শুরু হয়েছে। আজ ঐশী খেফালতের মাধ্যমে ইসলামের বিজয়ের মিছিল এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেক বছর প্রায় দ্বিগুণ হারে আল্লাহ্‌র পুণ্যবান বান্দারা যুগ-মসীহকে মেনে আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামে প্রবিষ্ট হচ্ছে। আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ শোকরিয়া যে, গত আন্তর্জাতিক বয়াতের সময় (১-৮-৯৯ তারিখ) তাঁর অশেষ ফযল ও করমে ১ কোটি ৮ লাখেরও বেশী লোক সারা বিশ্বে যুগ-খলীফার হাতে বয়াত হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছর হুযূর (আইঃ) এ প্রসঙ্গে তাঁর খোদার নিকট আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে দোয়াও করেছিলেন, আলহামদুল্লিাহ্।

আমরা প্রতিশ্রুত পুরুষকে মান্য করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। এখন ইসলামের বিশ্ব-বিজয়-কলেমা তওহীদের বিশ্ব-বিজয়ে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে উপলব্ধি করে ঐশী কর্মসূচীর সাথে পূর্ণ সহযোগিতার সময় এসেছে। ঐশী প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পুরোপুরি যথাযথভাবে পালন না করি তাহলে আমরা আমাদের আরব্ধ লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হবো না বিধায় যুগ-পুরুষকে মান্য করার পরও আমাদের ব্যক্তিগত বিফলতার মুখ দেখতে হবে। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে এথেকে রক্ষা করুন।

কুরআন মজীদ

সূরা আল্ আন'আম - ৬

১৬। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি ভয় করি এক ভয়ঙ্কর দিনের আযাবকে, যদি আমি আমার প্রভুর অবাধ্যতা [৮৩০] করি।'

১৭। সেই দিন যাহার উপর হইতে ইহা (আযাব) টলাইয়া দেওয়া হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে তিনি (আল্লাহ্) তাহার প্রতি রহম করিয়াছেন; এবং ইহাই [৮৩১] প্রকাশ্য সফলতা।

১৮। আর যদি আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশে জড়াইয়া ফেলেন তাহা হইলে তিনি ছাড়া কেহই উহা দূর করিতে পারে না; এবং যদি তিনি তোমাকে কল্যাণমন্ডিত করেন তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপরে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৯। বস্তুতঃ তিনি তাঁহার বান্দাগণের উপর প্রবল; [৮৩২] এবং তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞাত।

২০। তুমি বল, 'সাক্ষ্যদানে কোন অস্তিত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্; তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী।[৮৩৩] এবং এই কুরআন আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে যেন আমি ইহা দ্বারা তোমাদিগকে এবং যাহাদের নিকট ইহা পৌছে (ভাবী আযাব সম্বন্ধে) সতর্ক করিতে পারি। কী ! তোমরা কি বাস্তবিকই সাক্ষ্য দিতেছ যে, 'আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আরও অন্য উপাস্য আছে?' তুমি বল, 'আমি (এইরূপ) সাক্ষ্য দিব না।' তুমি পুনরায় বল, 'তিনি নিজ সত্তায় এক-অদ্বিতীয় উপাস্য এবং তোমরা যে সকল বস্তুকে (তাঁহার সহিত) শরীক কর, নিশ্চয় আমি ঐ সকল হইতে মুক্ত।'

২১। যাহাদিগকে আমরা এই কিতাব দিয়াছি তাহারা উহাকে সেইভাবে চিনে যেভাবে তাহারা নিজ সন্তান-সন্ততিকে চিনে। [৮৩৪] যাহারা নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারাই ঈমান আনিবে না।

২২। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁহার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে ? নিশ্চয় যালেমরা কখনও সফলকাম হয় না। [৮৩৫]

২৩। এবং (চিন্তা কর সেই দিনের) যে দিন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব; অতঃপর যাহারা (আল্লাহ্র সহিত) শরীক করিয়াছেন, আমরা তাহাদিগকে বলিব, 'তোমাদের ঐ সকল শরীক কোথায়, যাহাদিগকে তোমরা (শরীক বলিয়া) বিশ্বাস করিতে' ? [৮৩৬]

২৪। তখন এই কথা বলা ছাড়া তাহাদের আর কোন কৈফিয়ত থাকিবে না যে, 'আমাদের প্রভু, আল্লাহ্র কসম আমরা মুশরিক ছিলাম না।' [৮৩৭]

২৫। দেখ ! কীভাবে তাহারা তাহাদের নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিবে। এবং তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিত, তাহাদিগ হইতে ঐসব উধাও হইয়া যাইবে।

২৬। আর তাহাদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে; কিন্তু আমরা তাহাদের হৃদয়ের উপর পর্দা ফেলিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উহা বুঝিতে না পারে এবং তাহাদের কর্ণে বধিরতা (সৃষ্টি করিয়াছি)। অবস্থা এই যে, তাহারা যদি সকল প্রকার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তবুও তাহারা উহার উপর ঈমান আনিবে না; এমন কি যখন তাহারা তোমার সঙ্গে বিতর্ক করিতে করিতে তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, "ইহা প্রাচীন লোকদের কিচ্ছা-কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে।'

৮৩০। এই আয়াত আল্লাহ্তাআলার প্রতি অবাধ্যতার বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক থাকার উদ্দেশ্যে জোরালোভাবে পরামর্শ দান করিতেছে। ইহার অর্থ এই নহে যে, নবী করীম (সঃ) কখনো আল্লাহ্র অবাধ্য হইয়াছিলেন।

৮৩১। "যালিকা' শব্দ দ্বারা শাস্তি সরাইয়া দেওয়া অথবা 'অনুকম্পা' দান করা দুই-এর যে কোন একটি উদ্দেশ্যের প্রতি ইশারা হইতে পারে।

৮৩২। "আল্ কাহির" অর্থ ঃ - প্রবল, শক্তিমান, বিজয়ী, লাঞ্ছনা প্রদানকারী, সর্বোচ্চ, মহোত্তম, আল্লাহ্তাআলার এক নাম। পদার্থ এবং আত্মা আল্লাহ্র সহিত সহ-অস্তিত্ববান অর্থাৎ উহারা আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট নয়-এই মতবাদকে খন্ডন করে। যদি ইহাদিগকে আল্লাহ্তাআলা সৃষ্টি না করিতেন তাহা হইলে ইহাদিগকে দমন করা বা বশীভূত রাখার ক্ষমতা বা অধিকার তাঁহার থাকিত না।

৮৩৩। আল্লাহ্তাআলা তিনভাবে সাক্ষ্য বা প্রমাণ পেশ করেছেন–কুরআন মজীদ নাযেলের মাধ্যমে প্রথম প্রমাণ, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রমাণ পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত হইয়াছে।

৮৩৪। আল্লাহ্তাআলার কোন নবী (এবং ঈমানের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে কোন বিষয়) তাঁহার দাবীর শুরুতেই পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেন না। তাঁহার উপরে বিশ্বাস আনয়ন বা তাঁহার স্বীকৃতি দেওয়া হয় যেমন এক পিতা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহার পুত্রের পুত্রত্বের স্বীকৃতি দেয়-অদৃশ্য অবস্থার উপরেই সদা বিশ্বাসের ভিত্তি সূচিত হয়।

৮৩৫। তৃতীয় প্রকারের প্রমাণ বা সাক্ষ্য মানবীয় যুক্তি-ভিত্তিক। প্রত্যেক সাধু বা সৎ ব্যক্তি স্বীকার করিবেন যে, কোন মানুষ যদি আল্লাহ্তাআলার সাথে কথা বলিবার দাবী করে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, সে কেবল তাহার জীবনকে অকৃতকার্যতার মধ্যেই বিনাশ করে। অপরপক্ষে, যাহারা আল্লাহ্তাআলার প্রেরিত পুরুষ বা নবীর বিরোধিতা করে তাহারা কখনও উন্নতি করিতে পারে না এবং নতুন ধর্মের প্রতিবন্ধকতা বা গতিরোধ করার জন্য তাহাদের সকল প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া থাকে।

৮৩৬। তোমরা নিশ্চয়তার সহিত বলিয়াছিলে, দাবী করিয়াছিলে অথবা ঘোষণা করিয়াছিলে।

৮৩৭। পৌত্তলিকগণের এই অস্বীকৃতি প্রকৃতই তাহাদের অসহায়ত্বের মধ্যে অপরাধ স্বীকারের এক কাতরোক্তি এবং ইহা আল্লাহ্তাআলার অনুকম্পা আকর্ষণের এক ধরনের আবেদন বিশেষ।

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিক্হুম তাস্হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত

হাদীস শরীফ

ধৈর্য

কুরআন ঃ

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

তুমি বল, 'হে আমার বান্দাগণ যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের তাক্ওয়া অবলম্বন কর। যাহারা এই দুনিয়াতে কল্যাণ সাধন করে তাহাদের জন্য কল্যাণই অবধারিত আছে। এবং আল্লাহ্‌র পৃথিবী সুপ্রশস্ত। ধৈর্যশীলগণকে অবশ্যই বেহিসাব প্রতিদান দেওয়া হইবে (সূরা যুমার ঃ ১১)।

হাদীস ঃ

সোহায়েবনে সিনানিন রাযিআল্লাহু আনহু ক্বলা ক্বলা রসূলুল্লাহে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা আযাবান লে আমরিল মু'মিনি। ইন্না আমরুহু কুল্লাহু লাহু খায়রুন ওয়া লায়সা যালেকা লে আহাদিন ইল্লা লিল মু'মিনীন ইন আসাবাতহু সাররাআ শাকারা ফাকানা খায়রুল্‌লাহু ওয়া ইন আসাবাতহু যাররাআ সাবারা খায়রাল্‌লাহু (মুসলিম)।

অর্থাৎ সোহায়েবনে সিনানিন (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, মু'মিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক, তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া অন্যের ব্যাপার এরূপ নয়। তার জন্য আনন্দের কোন কিছু হলে সে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাতে তার কল্যাণ হয়। আবার ক্ষতিকর কোন কিছু হলে সে ধৈর্য ধারণ করে। ইহাও তার জন্য কল্যাণকর হয় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

মানুষকে আল্লাহ্‌তাআলা এমন কিছু গুণাবলী দান করেছেন যা মানুষ হবার জন্য অপরিহার্য। এ সকল গুণাবলীর মধ্যে ধৈর্য অন্যতম। পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ্‌তাআলা দোয়া ও ধৈর্যকে সফলতার মূল-মন্ত্র বলে চিহ্নিত করেছেন। ধৈর্য মানুষকে সাহসী, উদ্যমী ও খোদামুখী করে তুলে।

ধৈর্য এমন একটি গুণ যা মানুষকে দোয়ার দিকে টেনে নেয় এবং অন্যায়-অবিচার হতে রক্ষা করে। ধৈর্য মানুষের মাঝে বিনয় সৃষ্টি করে। সফলতার জন্য যে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয় ধৈর্য মানুষকে তা প্রদান করে।

আঁ হযরত (সঃ) মু'মিনের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন মু'মিন সর্বাবস্থায় খোদার সাথে সম্পর্ক রাখে। আনন্দের কিছু হলে খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ক্ষতিকর কিছু হলে ধৈর্য ধরে অর্থাৎ খোদার নিকট আত্মসমর্পণ করতঃ তার আশীষের ভিখারী হয়।

আজকাল মানব সমাজে যে অন্যায়-অবিচার ও অত্যাচার, ঝগড়া-ঝাটি মারা-মারি এসব কিছু ধৈর্যচ্যুতির কারণে হয়ে থাকে। ধৈর্য ধারণ করলে মানুষ অনেক অনিষ্ট হতে বাঁচতে পারে।

খোদাকে পাবার জন্যও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। নিরাশা মৃত্যু বিশেষ। নিরাশা হতে পরিত্রাণ পেতে হলে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। অনেকেই একটু দোয়া করে, একটু কান্নাকাটি করে, মনে করে যে, খোদা তো আমার দোয়া কবুল করলেন না। এমনভাবে অনেকে খোদা হতে ও দোয়া হতে নিরাশ হয়ে পড়ে। ইহা ঠিক নয়। খোদার নৈকট্য লাভের জন্য ধৈর্য বা সবর-এর খুব বেশী প্রয়োজন। সবর এর এক অর্থ হলো গুনাহ্ থেকে নিজেকে রক্ষা করা, কবুলিয়্যতে দোয়ার জন্য তাই সবর অপরিহার্য। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সবাইকে ধৈর্য ধারণ করতঃ খোদার আশীষের ভাগীদার হবার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী

অমৃত বাণী

ধৈর্য ও (খোদার উপর) ভরসা

"ধৈর্য ধর। কেননা, ইহা ধৈর্য ধারণ করার সময়। যে ধৈর্য ধারণ করে খোদাতাআলা তাহাকে বড় করেন। প্রতিশোধের দৃষ্টান্ত মদের নেশার ন্যায়। যখন অল্প অল্প পান করিতে আরম্ভ করে তখন ইহা বাড়িতে থাকে। এমনকি তৎপর সে ইহা ছাড়িতে পারে না এবং সীমালংঘন করে। এইভাবে প্রতিশোধ লইতে লইতে মানুষ যুলুমের সীমা পর্যন্ত পৌছিয়া যায়" (মলফুযাত, খন্ড ৬, পৃঃ ৩২, ৩৩)।

"নিশ্চিতভাবে স্মরণ রাখ, বিবেক ও উত্তেজনার মধ্যে বিপজ্জনক দুশমনী আছে। যখন উত্তেজনা ও রাগ আসে তখন বিবেক তিষ্ঠিতে পারে না। কিন্তু যে ধৈর্য ধারণ করে ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত দেখায় তাহাকে একটি জ্যোতিঃ দেওয়া হয় যদ্বারা তাহার বিবেক ও বুদ্ধির শক্তিতে একটি নূতন আলো সৃষ্টি হইয়া যায়। অতঃপর জ্যোতিঃ হইতে জ্যোতির সৃষ্টি হয়। যেহেতু রাগ ও উত্তেজনার অবস্থায় মন ও মস্তিষ্ক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, সেজন্য অন্ধকার হইতে অন্ধকার সৃষ্টি হয়" (মলফুযাত, খন্ড ৩, পৃঃ ১৮০)।

"বারবার এইরূপ হয় যে, এক ব্যক্তি বড় উত্তেজনার সহিত বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিরুদ্ধাচরণে ঐ পন্থা অবলম্বন করে যাহা ফাসাদ সৃষ্টিকারী পন্থা। ইহাতে শ্রবণকারীদের মধ্যে উত্তেজনার উদ্রেক হয়। কিন্তু যখন সে নরম উত্তর পায় এবং গালির মোকাবেলা করা হয় না তখন সে নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়ে এবং সে নিজের আচরণে লজ্জিত হইতে থাকে।

আমি তোমাদিগকে সত্য সত্যই বলিতেছি যে, ধৈর্যকে হাত ছাড়া করিও না। ধৈর্যের হাতিয়ার এইরূপ যে, তোপ দ্বারা ঐ কাজ হয় না যাহা ধৈর্যের দ্বারা হয়। ধৈর্যই হৃদয়কে জয় করিয়া নেয়। নিশ্চিতরূপে মনে রাখ, আমার খুব দুঃখ হয় যখন আমি এই কথা শুনি যে, অমুক ব্যক্তি এই জামাতের হইয়াও কাহারো সহিত ঝগড়া করিয়াছে। এই আচরণকে আমি কখনো পসন্দ করি না। খোদাতাআলাও চাহেন না যে, ঐ জামাত যাহাদের দ্বারা পৃথিবীতে এক নমুনা সাব্যস্ত হইবে তাহারা এইরূপ পথ অবলম্বন করে যাহা তাকওয়ার পথ নহে" (মলফুযাত, খন্ড ৭, পৃঃ ২০৩, ২০৪)।

"যখন আমি ধৈর্য ধারণ করি তখন তোমাদেরও ধৈর্য ধারণ করা উচিত। বৃক্ষের চাইতে তো শাখা বড় হয় না। তোমরা দেখ ইহারা কতদিন পর্যন্ত

(বাকী অংশ ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

জুমুআর খুতবা

আহমদী শহীদগণের স্মরণে

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত ১৮ জুন, ১৯৯৯ইং মসজিদ ফযল, লন্ডন]

তাশাহ্হুদ তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আল্ বাকারার ১৫৪ এবং ১৫৫ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন।

অতঃপর আয়াতদ্বয়ের অর্থ বলেন, "হে যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ্র নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাক নামায এবং ধৈর্যের মাধ্যমে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গে আছেন। এবং যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয় তাদের মৃত বলো না বরং তারাতো জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ না।

আমি আজকের খুতবা থেকে তৃতীয় খেলাফতের শহীদগণের স্মৃতিচারণ আরম্ভ করছি। এ প্রেক্ষাপটে **সর্বপ্রথম শহীদ রুস্তম খান** ময়দানের অধিবাসী এর বর্ণনা হবে। এই শাহাদত ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ইং সালে সংঘটিত হয়েছিল। মোকাররম শহীদ রুস্তম খান সাহেব তৃতীয় খেলাফতের যুগে প্রথম শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। যদিও তাঁর অবস্থা অনেকাংশে জামাতের ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে, তথাপি সাম্প্রতিককালে তাঁর সন্তানেরা যে ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন সম্ভবতঃ সেগুলি পূর্ণাঙ্গীন। এইজন্য তাদের বর্ণনার সঙ্গে মিল রেখে এই শাহাদতের স্মৃতিচারণ করবো। তার নাম শহীদ রুস্তম খান ঘাটক। পেশওয়ারের নিকটে ভেলো নামক একটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। নিজে আহমদী হয়েছিলেন, নিজের গ্রাম এবং আশে পাশের কয়েক গ্রামে একাই আহমদী ছিলেন। আহমদী হওয়ার পর সমস্ত গ্রাম তাঁর বিরোধী হয়ে গেল, তাঁকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হল। তাঁকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়, 'কাদিয়ানীয়ত' থেকে তওবা করার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করা হয়। তাঁর সন্তানদের মধ্যে পাঁচ মেয়ে এবং এক ছেলে রয়েছে। তাদের চাচা এবং অন্যান্যরা তার বংশকেই নিপাত করে দিতে চাচ্ছিল। মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়ার চক্রান্ত করা হয়েছিল। ছেলে কর্নেল আব্দুল হামীদ (বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডির অধিবাসী)-কে বার বার প্রাণে শেষ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। শহীদ নিজের চাকুরীর কারণে বেশীর ভাগ সময় বাইরে থাকতেন। গ্রামের মসজিদের মৌলভী ফতওয়া দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি রুস্তম খাঁর বংশকে নির্মূল করবে সে জান্নাতী হবে। তাঁর স্ত্রীকে কয়েকবার কোন কারণে গ্রামে যেতে হয়, তার খাওয়া-দাওয়ার থালা-বাসন পৃথক হত, সবাই নিম্ন জাতের মত ব্যবহার করত। খাবারে বিষ মিশানোরও চক্রান্ত করা হয়েছিল, যা সফল হয় নি। ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ সালে শহীদের পিতার মৃত্যু হয়, সন্তানেরা লাশ নিয়ে গ্রামে যায়। গ্রামে পৌছার সাথে সাথে সমস্ত গ্রামে মৌলভী ঘোষণা দেয় যে, গ্রামবাসী ! আনন্দিত হও আজ রুস্তম খাঁ কাদিয়ানী এসেছে তাকে হত্যা কর। তার সন্তানদের দেশান্তর কর অথবা গ্রামে রেখে দাও, তার এক ছেলে রয়েছে তাকে মেরে ফেল। যে নেকী অর্জন করতে চায় সে যেন বাহাদুর হয়ে সামনে আসে। কেননা, জান্নাত লাভের বড় সুন্দর সুযোগ

এসেছে। রাত্রে শহীদ রুস্তমের পিতার দাফনের পূর্বে যখন এই ঘোষণা হয়, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেন, তুমি কোনভাবে তোমার ভাই আব্দুস সালাম এবং আব্দুল কুদ্দুসকে সংবাদ দাও তারা যেন সমবেদনা জানানোর জন্য গ্রামে আসে এবং সন্তানদের নিয়ে যায়। কেননা, পরিস্থিতি ভালো নয় আমি বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে শংকিত। ছেলে আব্দুল হামীদ 'হামান আব্দাল' ক্যাডেট কলেজে পড়ছিল। তার দাদার মৃত্যু উপলক্ষ্যে গ্রামে আসছিল। যখনই গ্রামে পৌছল তখন দেখে এক ব্যক্তি মুখ ঢেকে গ্রামের বাইরে যেখানে গাড়ী থামে সেখানে এক জায়গায় লুকিয়ে আছে। আব্দুল হামীদ তাকে দেখে পিছন থেকে ধরে ফেলে। দেখে গেল লোকটি তার চাচা। সে বলল, 'চাচা আপনি' ? চাচা-ভীত হয়ে বল্লেন, আমি তোমার হেফাযতের জন্য বসে আছি, কেননা, মানুষ তোমাকে হত্যা করতে চায়। সে যখন এই ঘটনা তার মাকে বল্ল, তখন তার মা আরো চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মামার আসার পরে তাকে এবং অন্য সন্তানদের সেখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। দ্বিতীয় দিন ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ সালে শহীদ রুস্তম খান ভোরের নামাযের ওযূর জন্য ক্ষেতের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন গুলির আওয়াজে তার স্ত্রী বাইরে বের হলেন। পিছন থেকে শহীদ রুস্তমের ভাইয়েরা তাকে ধরে ফেলে, যেহেতু তিনি পূর্ব থেকেই সাবধান ছিলেন তাই তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যান। বাইরে গিয়ে দেখলেন শত্রুরা কাজ সম্পাদন করে ফেলেছে এবং তার স্বামী আল্লাহ্র রাস্তায় শাহাদত বরণ করেছেন। আর মানুষ সন্তানদেরকে খুঁজছিল। কিন্তু সন্তানরা তো পূর্বেই সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্তাআলা শহীদের স্ত্রীকে ধৈর্য শক্তি দিয়েছিলেন। গ্রামের মৌলভী এসে বল্ল, কার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবে ? তিনি বললেন, এ বিষয়টি আল্লাহ্র সোপর্দ। তোমরা সবাই রাস্তা থেকে সরে যাও আমি আমার স্বামীর লাশকে পেশোওয়ার নিয়ে যাব, আর সেখানে আমাদের জামাতের সদস্যরা তাঁকে দাফন করবে। একজন বিধবা মহিলার মন জয়ের পরিবর্তে গ্রামের সমস্ত মানুষ তাকে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে যে, তাকে এখানেই দাফন করে দাও আর সন্তানদেরকে আমাদের কাছে সোপর্দ করে যাও যেন আমরা তাদের আবার মুসলমান বানাতে পারি। সেই সময় তাঁর স্ত্রী লাশের সামনে দাঁড়িয়ে একটি বক্তৃত করেন, 'আজ আমি এখান থেকে আমার স্বামীর লাশকে নিয়েই ছাড়ব। তবে স্মরণ রাখবে, যে সত্যকে রুস্তম খাঁ পেয়েছিল আমি ও আমার সন্তান সেই সত্য থেকে মুখ ফিরাব না। রুস্তম খানের বংশ-বৃদ্ধি পাবে, ইনশাআল্লাহ্।' সমস্ত মানুষ বল্ল, এই মহিলা পাগল হয়ে গিয়েছে। বিলাপ করার পরিবর্তে বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছে। পরের দিন শহীদের স্ত্রী শহীদের লাশ নিয়ে পেশোওয়ার আসেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

শত্রুদের পরিনাম ঃ এক বৎসরের মধ্যে শহীদের এভাই যে শহীদের ছেলে আব্দুল হামীদকে হত্যার চেষ্টা করে, তার একমাত্র যুবক পুত্র কূপে পড়ে মারা যায়। দ্বিতীয় চাচার ছেলে দুর্ঘটনায় কবলিত হয়। তৃতীয় চাচা আকস্মাৎ মারা যায়। কেন মারা গেল কিছুই জানা যায় নি। আর এক চাচা মারা গেল হঠাৎ করে বৃষ্টিতে পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে আর তার দুই ছেলে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

শহীদ রস্তম খানের উত্তরসূরী ঃ বিধবা স্ত্রী ছাড়া এক ছেলে এবং পাঁচ মেয়ে রেখে গিয়েছেন। কর্নেল আব্দুল হামীদ খাটাক রাওয়ালপিন্ডিতে থাকেন। বড় মেয়ে শামিমা আক্তার সাহেবা কর্ণেল মুজিব আহমদ সাহেবের স্ত্রী আমেরিকাতে বসবাস করছেন। দ্বিতীয় মেয়ে রোকাইয়া বেগম সাহেবা সাহেবযাদা জামীল লতীফ সাহেবের বিবি। তৃতীয় মেয়ে ইয়াসমিন আমেরিকায় ডাক্তার কাযী মনসুর আহ্মদ সাহেবের বিবি। চতুর্থ মেয়ে নিগহাত রেহেনাও আমেরিকার নাসের আহমদ সাহেবের বিবি। পঞ্চম মেয়ে নাহিদা সুলতানা সাহেবা কর্ণেল ওয়েজ তারিক সাহেবের স্ত্রী ও কানাডায় বসবাস করছেন।

মৌলভী আব্দুল হক নূর সাহেব, শাহাদতের তারিখ ২১ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ইং। তিনি কাদিয়ানের নিকটস্থ গ্রাম ভাটিয়াগোটের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা মোকাররম এলাহী বখশ্ সাহেব একজন প্রতিষ্ঠিত জমিদার ছিলেন। হিন্দু শিখ এবং মুসলমান সবাই তার কাছে সমস্যাদি মীমাংসা করাত। তিনি চার বৎসরে হেড মাষ্টারের চাকুরী করে তা ছেড়ে দেন। দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনার পর ১৯৩৪ সনের সালানা জলসায় বয়াত হন। বয়াতের পর পরই তাঁর বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়। তিনি বিরোধী মৌলভীদের মুবাহালার ডাক দেন। মুবাহালার দাওয়াত লিখিত ছিল। লেখা ছিল যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যদি সত্য হন তাহলে সর্ব প্রথম বিরুদ্ধবাদী মৌলভীর ছেলে মারা যাবে। তারপর সেই মৌলভী মারা যাবে সেই অনুযায়ী তিনি মৌলভী মোহাম্মদ ইসমাঈলের সঙ্গে মুবাহালা করেন আর সেই মৌলভী মারা যায়। এই সংবাদ শহীদের ভাই শহীদকে দেয়। তিনি প্রতাপের সাথে এসে বলেন, মুবাহালার লেখনীতে তো ছিল আগে তার ছেলে মারা যাবে। সংবাদ নাও তার ছেলে মারা গিয়েছে কিনা ? সংবাদ নিয়ে দেখা গেল যে, প্রথমে তার ছেলে মারা গিয়েছিল তারপর সে নিজে মারা গিয়েছে। এ ঘটনা দেখে তাঁর ভাইও বয়াত হয়ে গেল। কৃষি কাজের ব্যাপক অভিজ্ঞতার কারণে দেশ বিভক্তির পর তাঁকে মাহমুদাবাদ, নাসেরাবাদ ও অন্যান্য এলাকায় কৃষি কাজ দেখা শোনার জন্য নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪২ সনে তিনি কুন্তিতে স্থানান্তরিতে হন এবং জমি জমা বর্গা নেওয়া শুরু করেন। তিনি উৎকৃষ্ট দাঈ ইলাল্লাহ্ ছিলেন। তার তবলীগে তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে থেকে পঞ্চাশ জনের মত আহমদী হয়েছিল। কুন্তি জামাতের ভিত্তি তিনিই স্থাপন করেছিলেন। শাহাদতের সময় পর্যন্ত তিনি কুন্তি জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

শাহাদতের ঘটনা ঃ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ সনে কতক উগ্রপন্থী দুষ্কৃতকারী তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পনা নেয় ও হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এতদুদ্দেশ্যে তারা দু'জন ভাড়াটে খুনী তাঁর কাছে এমনভাবে পাঠায় যেন তারা বয়াত হবে। তিনি অভ্যাসানুযায়ী তবলীগ করেন। সন্ধায় ঘরে নিয়ে আসেন মেহমানদারী করেন নামায বা-জামাত আদায় করেন। তারপর ফজরের সময় নিজে পানি গরম করেন, তাদের ওযূ করান এবং নামায পড়ান। নামাযের পর বাইরে নিজের বাগানে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ চৌকিতে বসে তাদেরকে তবলীগ করেন। তারপর তাদেরকে নিয়ে বাগানে প্রাতঃভ্রমণে চলে যান। প্রাতঃভ্রমণ থেকে ফিরতে দেরী দেখে ইয়াকুব সাহেব নিজের ভাতিজা মকসুদ আহমদ সাহেবকে বলেন, খোঁজ নাও তোমার দাদা আসছেন না কেন ? অনেক দেরী হয়ে গেছে। মকসুদ আহমদ বলেন, আমি যখন বাগানে গেলাম তখন দেখি আমাদের মেহমান যারা মৌলবী আব্দুল হক সাহেবের সাথে বাগানে গিয়েছিল তারা পালিয়ে যাচ্ছে। আমার সন্দেহ হয় তাই আমার চাচাকেও ডাক দিই যে, এখানে আসেন তারপর আমার বাগানের এদিক সেদিক দেখলাম। দাদা জানকে যখন দেখি তখন তাঁকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন) শহীদ মরহুম মুসী ছিলেন। এক বছর পর্যন্ত কুন্ডিতে আমানত হিসেবে দাফন করে রাখা হয়, তারপর রাবওয়ার বেহেশতি মকবেরায় দাফন করা হয়।

শহীদ রশিদ আহমদ সাহেব বাট কুনডিয়ারু, জেলা নবাব শাহ্। শাহাদতের তারিখ ১৯ মে, ১৯৭৪। শহীদ রশিদ আহমদ সাহেব বাট ইবনে মুহাম্মদ দীন সাহেব বাট কুনডিয়ারুর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর আসল পৈতৃক গ্রাম তহশিল শোগল গড়, জেলা সিয়ালকোট ছিল। জীবিকার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করেন। অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, মিশুক, উৎকৃষ্ট দাঈ-ইলাল্লাহ্, ইবাদতকারী, জামাতের জন্য নিবেদিত প্রাণ, কেন্দ্রের প্রত্যেক আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়াদানকারী,প্রত্যেক প্রকার কুরবানী এবং জামাতের একনিষ্ঠ খেদমতকারী ছিলেন। ১৬ মে, ১৯৭৪ সালে ইসলামী জমিয়তে তোলাবা-এর ছাত্র তাঁর উপর আক্রমণ করে যার কারণে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। তাঁকে আপেক্ষিকভাবে হাসপাতালে পৌছান হয়, কিন্তু যখন 'নবাব শাহ্ হাসপাতাল' এর ডাক্তার ব্যর্থ হন তখন তাঁকে হায়দারাবাদ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেও চিকিৎসা ব্যর্থ হয়। তিনি ১৯ মে, ১৯৭৪ইং তারিখে খোদার সমীপে জীবন উৎসর্গ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। ৩০ মে, ১৯৭৪ইং তারিখে তাঁর জানাযা হয় যাতে আহমদী ছাড়াও বৃহৎ সংখ্যক গয়ের আহমদী শরীক হন। শহীদ মরহুমকে তাঁর নিজের জমিতে দাফন করা হয়।

তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে বিধবা স্ত্রী ছাড়াও চার ছেলে মেয়ে রয়েছেন। তাঁর হত্যাকারী রফিক ময়মন কোন অপরাধে সাত বৎসর জেলে ছিল। সেখান থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সে দুর্ঘটনা কবলিত হয় এবং তার উপর দিয়ে ট্রাক চলে যায়। তার লাশকে সারা রাত কুকুর ছিন্ন ভিন্ন করে খেতে থাকে। তার পরিবার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পরিবার ছিল। তার পরিবার এবং ব্যবসা সব ধ্বংস হয়ে যায়।

মোকাররম আফযাল খোকার সাহেব এবং মুহাম্মদ আশরাফ খোকার সাহেব. জেলা গুজরাঁওয়ালা। শাহাদতের তারিখ ১লা জুন, ১৯৭৪ইং। মোকাররম আফযাল খোকার সাহেবের স্ত্রী সাঈদা আফযাল বর্ণনা করেন, শাহাদতের কয়েকদিন পূর্বে শহীদ ইশার নামায পড়ে ঘরে ফিরে আসেন। আমি বিছানায় শুয়ে কাঁদছিলাম, দেখে বল্লেন, 'সাঈদা কাঁদছ কেন ? আমি বললাম, আমি এই বই 'রওশন সেতারে' পড়ছিলাম। আর আমার হৃদয় একান্ত বাসনা জন্মে যে, হায়, আমিও যদি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর যুগে হতাম, তাহলে আমার নাম কোন না কোনভাবে এমন রওশন সেতারায় উজ্জল তারকাদের অন্তর্ভুক্ত হত। এতে শহীদ আফযাল সাহেব বল্লেন, এটা আখারীন এর যুগ, আল্লাহ্র সমীপে কুরবানী পেশ কর তুমিও প্রথম যুগের সাথে শামিল হতে পারবে। আমি কি জানতাম যে, এত দ্রুত আল্লাহ্তাআলা আমার বাসনাকে পূর্ণ করবেন এবং এত বেদনাপূর্ণ কুরবানীর ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হতে হবে ? ৩১ মে রাত্রিতে আহমদীদের বিরুদ্ধে গন্ডগোল চরম অবস্থায় ছিল। সারা রাত দোয়া করতে করতে কেটে গেল। যতটুকু সম্ভব

আমরা আত্মরক্ষা করতে থাকি। আমার চিন্তাতেও ছিল না যে, আমার স্বামী এবং ছেলের সঙ্গে এটি আমার শেষ রাত হবে। ১লা জুন শত্রুদের মিছিল এসে আক্রমণ করে। শহীদ আফযাল মহিলাদেরকে প্রতিবেশীদের ঘরে পাঠিয়ে দেন আর তিনি নিজে ও তাঁর ছেলে ঘরে থেকে যান। কেননা, সেই সময় এই নির্দেশই ছিল যে, কোন পুরুষ নিজের ঘর ছাড়বে না তবে মহিলা ও বাচ্চাদের রক্ষার জন্য নির্দ্ধিধায় নিরাপদ স্থানে পৌছান যেতে পারে। তিনি বলেন যে, সমস্ত দিন হৈ হল্লা হতে থাকে, আক্রমণ চলতে থাকে আর ভাঙ্গচুর হতে থাকে। কিন্তু আমরা কিছুই জানতাম না যে, পিতা পুত্রের উপর কি চলছে ? যালেমরা তাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করছে ? রাতে আমাদেরকে অন্য আরেক ঘরে পৌছান হয়। সেখানে নিজের স্বামী ও ছেলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। রাত ১১টায় আমাদেরকে জানানো হয় যে, পিতা ও পুত্র উভয়েই শহীদ হয়েছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন) পরবর্তীতে জানা যায় যে, তাঁদেরকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ছুড়ি মারা হয়। নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে আসে, তারপর ইট দিয়ে মাথা থেত্লে দেয়া হয়। এভাবে প্রথমে ছেলেকে পিতার সামনে হত্যা করা হয়। যখন সেই যুবক ছেলেকে এভাবে দলিত-মথিত করে পিষে মারা হয়। তারপর যালেমরা পিতার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলে এখনও সময় আছে ঈমান আন। আর মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নোংরা গালি দাও। ঘটনায় উপস্থিত একজন সাক্ষীর বর্ণনা অনুযায়ী, আফযাল জবাব দেন, তোমরা কি আমাকে ঈমানে ছেলের চেয়ে দুর্বল মনে কর ? যে আমার সামনে এমন বীরত্বের সাথে জীবন দিয়েছে। শেষ মুহূর্তে পানির জন্য যখন আহাজারি করছিল তখন ঘর নির্মাণের জন্য যে বালু পড়া ছিল সেগুলো তার মুখে ঢেলে দেওয়া হয়। পিতা এ দৃশ্যও দেখেছিল। তিনি বলেন, যা ইচ্ছা কর, এর চেয়েও যদি ঘৃণ্য আচরণ আমার সাথে কর তবুও আমি আমার ঈমান থেকে বিচ্যুত হব না। এর ফলে তাঁকেও তেমনি নির্মমভাবে, কষ্ট দিয়ে শহীদ করা হয়। অতঃপর উভয়ের লাশকে তৃতীয় তলা থেকে নীচে ফেলে দেয়া হয়। সারাদিন তাদের লাশ সরানোর অনুমতি কারও ছিল না। মোকাররম আফযাল খোকার সাহেবের উত্তরসূরীদের মধ্যে বিধবা স্ত্রী ছাড়া তিন মেয়ে ও দুই ছেলে রেখে গিয়েছেন। দুই মেয়ে, তৈয়্যবা সাঈদ সাহেবা ও তাহেরা মাজেদ সাহেবা কানাডায় অবস্থান করছেন। এক মেয়ে স্নেহের সামীনা ইয়াসমীন খোকার এখানে যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছেন। দুই ছেলে আসিফ মাহমুদ খোকার এবং বেলাল আহমদ খোকার কানাডায় বাস করছেন আর এখন পর্যন্ত অবিবাহিত আছেন। সকল উত্তরসূরী পার্থিব ও আধ্যাত্মিক নেয়ামতে পরিপূর্ণ।

শহীদ চৌধুরী মুনজুর আহমদ ও শহীদ মাহমুদ আহমদ সাহেব, গুজরাঁওয়ালার অধিবাসী। শাহাদতের তারিখ ১লা জুন, ১৯৭৪ইং। চৌধুরী মুনজুর আহমদ সাহেবের বিধবা স্ত্রী রাফিযা সিদ্দীকী সাহেবা লেখেন যে, ১৯৭৪ সনের জুন মাসে যখন অবস্থা খারাপ হতে থাকে তখন পুলিশ তাঁর ছেলে মোকসেদ আহমদকে একজন মৌলভীর কথায় তাদের দোকান থেকে গ্রেফতার করে হাজতে বন্দী করে। পরের দিন মিছিল ঘরে আক্রমণ করে। মহিলাদেরকে বাহ্যতঃ নিরাপদ ঘরে পৌছে দেয়া হয়। কিছু লোক সংবাদ দেয় মিছিল তাদের ঘরে আগুন দিয়েছে সেখানে অবস্থিত সকলেই আহত হয়েছে। অথচ সেই সময় পর্যন্ত তাদেরকে শহীদ করে ফেলা হয়েছে। সেদিন সন্ধ্যা বেলা একটি ট্রাক যখন ৬ (ছয়) জন শহীদের লাশ নিয়ে রাহওয়ালী পৌছে তখন উত্তরসূরীরা অবগত হন যে, তাদের প্রিয়রা শহীদ হয়ে গিয়েছেন। পিছু নেয়া মিছিলের ভয়ে ট্রাক সেই লাশগুলোকে নিয়ে চলে যায়, আর উত্তরসূরীরা তাদের প্রিয়জনের চেহারাও দেখতে পায় নি। রুকিয়া সিদ্দীকা সাহেবা নিজের ছেলের শাহাদতের ঘটনা আরও বিস্তারিত জানিয়ে লেখেন, মিছিলের সঙ্গে যে পুলিশ ছিল তাদের একজন সিপাহী রাহওয়ালীর অধিবাসী ছিল। সে জানায়, ১লা জুন সিভিল লাইনের এক ঘরের ছাদে যে ঘটনা ঘটে তা দেখে বুঝলাম সাহাবারা কীভাবে আত্মোৎসর্গ করতেন। সে বলে আমি সেই ছেলেকে কখনও ভুলতে পারব না যার বয়স বড় জোর ১৭/১৮ হবে। ফর্সা দীর্ঘ দেহের অধিকারী। তার হাতে একটি বন্দুক ছিল। মিছিলে শামিল পুলিশ সহ বড় একটি অংশ ছাদে উঠে আসে। আমাদের একজন সাথী গিয়েই তার হাতে লাঠির আঘাত করে, বন্দুক কেড়ে নেয়। মিছিল এ ছেলের উপর অত্যাচার করছিল। মিছিলের মধ্যে থেকে কেউ বলল, মুসলমান হয়ে যাও এবং কলেমা পড়। সে কলেমা পড়ে আর বলে আমি সত্যিকার আহমদী মুসলমান। মিছিলের মধ্যে কেউ বলে, মির্যাকে গালি দাও। সেই ছেলে নিজের মাথায় হাত চাপড়িয়ে বলে, আমি কখনও একাজ করব না। তাদের কোন কথা সে শোনে নি। সে বলে, তোমরা তাঁকে গালি দেয়ার কথা বলছ, যিনি আমার জীবন থেকে বেশী প্রিয়। সেই সাথে সে মসীহ মাওউদ জিন্দাবাদ ও আহমদীয়ত জিন্দাবাদের নাড়া উচ্চারণ করে। নাড়া দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিছিল তাঁকে ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে আর তার উপর ইট পাথরের বর্ষণ আরম্ভ হয়ে যায়। ছাদের উপর নির্মিত জালী ভেঙ্গে তারা তার উপর নিক্ষেপ করে। আর এই ঘটনা সেদিন পুলিশের সেই সিপাহী নিজের চোখে দেখে। এ যুলুমকারীদের কি পরিণতি হয়েছে তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তবে এমন অত্যাচারীদের অধিকাংশই পরকালের শাস্তি ছাড়াও পার্থিব শাস্তিতে নিপতিত হয়ে থাকে। যাদের অবস্থা জানা গিয়েছে তা থেকে এ-ই প্রমাণিত হয়।

মোকাররম শহীদ চৌধুরী শওকত হায়াত খান সাহেব। শাহাদতের তারিখ ১লা জুন, ১৯৭৪ সাল। মোকাররম শহীদ চৌধুরী শওকত হায়াত খান সাহেব হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবী অবসর প্রাপ্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর মোকাররম মুহাম্মদ খান সাহেবের ঘরে হাফেযাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। হাফেযাবাদে এবং কাদিয়ানে শিক্ষা গ্রহণের পর পুলিশে চাকুরী নেন। ৩১মে, ১৯৯৪ রোজ শুক্রবার হাফেযাবাদ শহরে গন্ডগোল হয়। আর ১লা জুন এই গন্ডগোল ভয়ানক আকার ধারণ করে। হৈ হল্লাকারী দল শহরে শ্লোগান দিচ্ছিল। শহীদ মরুহুমের বাচ্চাদের একটি ষ্টেশনারী দোকান ছিল। এর সম্বন্ধে খবর পান যে, তা লুটে নেওয়া হয়েছে। আর বয়ে যাওয়া জিনিসগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বাচ্চাদেরকে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে অবগত হন যে, শত্রুরা লুটতরাজ করে পালিয়ে গিয়েছে। পুলিশ আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। তিনি দোকানের সামনে বসে ছিলেন। তাঁর এক ছেলে তাঁর সঙ্গে ছিল। সেই সময় একটি মিছিল আসে যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি করছিল। শহীদ মিছিলে নেতৃত্ব দানকারীদেরকে বল্লেন, লজ্জা কর, যার তোমরা অবমাননা করছ তিনি তোমাদের কি ক্ষতি করেছেন ? তিনি সেই সময় অনুমান করতে পারেন নি যে, সেই সময় নীতির উপর সন্ত্রাসের প্রাধান্য ছিল। এজন্য তারা শান্ত হওয়ার পরিবর্তে আরো উত্তেজিত হয়ে গেল। তার এ কথাগুলো আগুনে কেরোসিনে ঢালার মত কাজ করল। তারা বল্ল, একে ধর, কাছেই রেল লাইন ছিল। তারা সেখান থেকে পাথর উঠিয়ে তাকে মারতে লাগল। তাঁর ছেলে শফকত হায়াত সেখানে উপস্থিত ছিল সে শত্রুদের নিক্ষিপ্ত পাথর উঠিয়ে তাদের মারতে থাকল আর কিছুক্ষণ তাদেরকে সামনে অগ্রসর হতে দেয় নি। সেই সময়

শত্রুদের কেউ বল্‌ল যে, সামনে দিয়ে তোমরা তাদের সঙ্গে কামিয়াব হবে না তাই ঘরের পিছন দিক দিয়ে আক্রমণ কর। তারা পিছন দিয়ে আক্রমণ শুরু করে। শহীদের ছেলেকে শত্রুরা পাথর দিয়ে মারাত্মক আহত করে। তাঁর শরীরে চল্লিশটির মত ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তিনি লাগাতার এক মাস চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে যান। তাঁর পিতা শওকত হায়াতকে যালেমরা টেনে হিঁচড়ে নীচে নিয়ে যায় আর পাথর মেরে তাঁকে রক্তাক্ত করে দেয়। ততক্ষণ পুলিশ এসে যায় আর সন্ত্রাসীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তখনও তাঁর ভিতর প্রাণের স্পন্দন ছিল। তাঁর এক আত্মীয় মোকররম হাকীম নওয়াজ সাহেব নিজের গাড়ীতে করে লাহোরের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু রাস্তাতেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন) তিনি বিধবা স্ত্রী ছাড়াও এক মেয়ে ও তিন ছেলে রেখে গেছেন। শহীদের স্ত্রী ১৯৯০ সনের ফেব্রুয়ারীতে ইন্তেকাল করেন। আর বেহেশ্‌তী মকবেরায় কবরস্থ আছেন। মেয়েদের মধ্যে এক মেয়ে নিশাত আফযা-এর ডাসকাতে বিবাহ হয়েছে। বড় ছেলে শওকত হায়াত গুজরাঁওয়ালাতে ব্যবসা করছেন। দ্বিতীয় ছেলে আযমত হায়াত কানাডায় টরেন্টোয় বাস করছেন। তৃতীয় ছেলে শাহাদত হায়াত জার্মানীতে অবস্থান করছেন।

শহীদ কুরায়েশী আহ্‌মদ আলী সাহেব গুজরাঁওয়ালার অধিবাসী। শাহাদতের তারিখ ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ। তিনি ১৯৪৬ সনে সিয়ালকোটের সিনহাওয়ালটাতে মোকাররম হাকীম ফযল উদ্দিন সাহেবের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর গুজরাঁওয়ালাতে স্থানান্তরিত হন।

শাহাদতের ঘটনা ঃ ২৯ মে, ১৯৭৪ গুজরাঁওয়ালাতে অবস্থা খারাপ হতে আরম্ভ করে। তাঁর ছেলে ডাঃ নাসির আহমদ সাহেব আতফালের জেলা নাযেম ছিলেন আর জামাতের পক্ষ থেকে অবস্থা পর্যবেক্ষণের দায়ীত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ঘরে এসে নিজের পিতাকে বলেন, অবস্থা ভাল নয়। পিতা বল্‌লেন, আল্লাহ্‌ ফযল করবেন। ৩০ মে অবস্থার আরও অবনতি হয়। ১লা জুন মহিলা এবং বাচ্চাদের কুরাইশী মজীদ আহমদ সাহেব জেলা সুপারিনটেনডেন্ট-এর ঘরে পৌছিয়ে দেয়া হয়। আর পুরুষদের গ্রীন রোডে এক আহমদীর ঘরে একত্রিত করা হয়। মিছিল তাদের পিছু নেয়। সর্বপ্রথম সাঈদ আহমদ সাহেবের সম্মুখে মোকাররম মুনজুর আহমদ সাহেবকে শহীদ করা হয়। তাদের ঘরে কুরায়েশী আহমদ সাহেবও ছিলেন। সন্ত্রাসীরা ফিরে এসে তাঁর উপর বেলচা দিয়ে আক্রমণ করে, আঘাত এত গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে যে, শহীদ ঘটনাস্থলেই মারা যান।

শহীদ সাইদ আহমদ সাহেব ইবনে মুহাম্মদ ইউসুফ আহমদ সাহেব মন্দোখেইলের অধিবাসী। শাহাদতের তারিখ ১লা জুন, ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ। শহীদ সাঈদ আহমদ সাহেব ২৬ মে, ১৯৩৭ সনে ফয়সালাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। প্রারম্ভিক শিক্ষা কাদিয়ানে লাভ করেন। লাহোর থেকে মেট্রিক পাশ করেন। লাহোর থেকেই ইন্টারমেডিয়েট পাশ করেন। ১৯৬৩ সনে চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ সাহেবের মেয়ে আনিসা তৈয়্যেবার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ফয়সালাবাদে সেক্রেটারী মাল এবং কায়েদ খোদ্দামুল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। চাকুরীর উদ্দেশ্যে কোয়েটা অবস্থানের সময় সেখানেও খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কায়েদ ছিলেন। তিনি নাইরোবি কেনিয়াতেও কিছুকাল কাটিয়েছেন। সেখানে প্রথমে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব কায়েদ ছিলেন তারপর খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ হিসাবে খেদমত করতে থাকেন। তারপর গুজরাঁওয়ালাতে স্থানান্তরিত হন। তিনি যখন সিভিল লাইন গুজরাঁওয়ালাতে ঘর বানান তখন সেই সাথে আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তিও রাখেন। মসজিদের সীমানায় জামাতে আহমদীয়ার বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়। সেই দিন থেকেই আশে পাশের মসজিদের মোল্লারা তাঁর কঠোর বিরোধিতা শুরু করে দেয়। ১৯৭৪ সনে পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার পূর্বেই মসজিদের বোর্ড নামাবার, আহমদী মসজিদ, এবং তাঁকে শহীদ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়।

শাহাদতের ঘটনা ঃ ১৯৭৪ সনের ১লা জুন রোজ শনিবার সিভিল লাইন গুজরাঁওয়ালাতে ভোর বেলা মিছিল আসে। মিছিলের সাথে পুলিশও ছিল। মোকাররম সাঈদ আহমদ সাহেব থানার কর্মকর্তার নিকট গিয়ে বলেন মিছিলকে বাধা দাও, কিন্তু দীর্ঘ বিতর্কের পরও কোন ফল হয়নি। শেষে তিনি যখন ফিরে আসছিলেন তখন থানার কর্মকর্তা মিছিলকে তাঁর দিকে ইশারা করে। এতে মিছিল মোকাররম সাঈদ আহমদ সাহেবের উপর আক্রমণ করে। পাথর এবং লাঠির আঘাতে নির্মমভাবে ঘটনাস্থলেই তাঁকে শহীদ করা হয় (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

উত্তরসূরী ঃ শহীদ মরহুম নিজের স্ত্রী, এক ছেলে এবং চার মেয়ে রেখে গেছেন। বড় ছেলে বর্তমান অষ্ট্রেলিয়ায় আছেন। মেয়ে মনওয়ারা মোকাররম মোবারক আযম সাহেবের স্ত্রী, কানাডায় বসবাস করছেন। আর সেক্রেটারী তরবীয়তের দায়িত্ব পালন করছেন। দ্বিতীয় মেয়ে ফারযানা মুনীর সাহেবাও বিবাহিতা। তাঁর স্বামী মোকাররম মুনীরা আহমদ সাহেব, নায়েব নাযেম আনসারুল্লাহ্‌ শেখুপুরা। তৃতীয় মেয়ে শবনব নওয়াজ সাহেবা বর্তমানে কানাডায় আছেন। চতুর্থ মেয়ে দুররে সামীন মাসুদ সাহেবা বিবাহ মৌলবী গোলাম আহমদ বদ্দমলী সাহেবের নাতী মাসুদ আহমদ সাহেবের সাথে সম্পন্ন হয়েছে আর বর্তমানে করাচীতে বসবাস করছেন।

গুজরাঁওয়ালার অধিবাসী **বশীর আহমদ সাহেবের এবং মুনীর আহমদ সাহেবের শাহাদত ঃ**

শাহাদতের তারিখ ২রা জুন, ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ। বশীর আহমদ সাহেব আহমদীয়তের কেন্দ্র কাদিয়ানের নিকটবর্তী একটি গ্রাম টুডেমলে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের সময় তাঁর বয়স চার বৎসর ছিল। মেট্রিকের পর স্বাস্থ্য বিভাগে চাকুরী নেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত এই বিভাগের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর ছোট ভাই মুনীর আহমদ সাহেব ১৯৫৬ সনের ডিসেম্বরে গুজরাঁওয়ালাতে জন্মগ্রহণ করেন। শাহাদতের সময় তাঁর বয়স ২০ (কুড়ি) বৎসর ছিল। তিনি অবিবাহিত ছিলেন আর এক কারখানায় চাকুরী করতেন।

শাহাদতের ঘটনা ঃ ১লা জুন রোজ শনিবার ডিউটি সেরে ঘরে এসে নিজের মাকে বললেন মা মিছিল আসছে। মা বলল, বাবা বল তোমার কি খেতে ইচ্ছা করে, আমি সেই জিনিসই রান্না করব। মা ছেলের খায়েশ অনুযায়ী ভাত রান্না করলেন, কিন্তু ছেলে তৃপ্তি সহকারে খায় নি। এরপর তিনি তাঁর মা-বাবাকে বন্ধু সেলিমের ঘরে রেখে আসলেন। আর তাদের হেফাযতের জন্য জোর দেন। উভয় ভাই বশীর আহমদ এবং মুনীর আহমদ সাহেব রাত জেগে ঘরের ছাদে পাহারা দেন। মিছিল যে দিক থেকে আসার প্রত্যাশা ছিল সেদিকে ঘিরে রাখা ছিল (পুলিশের পক্ষ থেকে)। মিছিল এত বড় ছিল যে, বাধা দেয়া সম্ভব হয় নি আর তাদের ঘরের নিকট পর্যন্ত চলে আসে। তিনি (মুনীর) তাঁর সাথীকে বল্‌লেন যে, আমরা পালাব না। হুযূরের নির্দেশ রয়েছে মরে গেলেও নিজের ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাবে না। মিছিল আক্রমণ শুরু করে দেয় এবং তাদের দুই সহোদর ভাই বশীর আহ্‌মদ এবং মুনীর আহ্‌মদকে ঘটনাস্থলেই অত্যন্ত কষ্ট দিয়ে শহীদ করে দেয় (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন)।

শহীদ মুহাম্মদ রমযান সাহেব এবং মুহাম্মদ ইকবাল সাহেব উভয়ের পিতা মোহতরম আলী মুহাম্মদ সাহেব। শাহাদতের তারিখ ২০শে জুন, ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ। **তহশিল ঃ** করনকারা, জিলা অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন। উভয়ে কাদিয়ানের নিকটবর্তী গ্রাম গোরোওয়াল। (খলীফাতুল মসীহ বলেন, যা লেখা রয়েছে তেমন নিকটবর্তী তো নয়। যাই হোক লেখা আছে যে, কাদিয়ানের নিকটবর্তী একটি গ্রাম)। ১৯৪৭ সনে যখন পাকিস্তানের জন্ম হয় তখন তাদের মা-বাবা সেখান থেকে জায়গা পরিবর্তন করে ফয়সালাবাদে বসতি স্থাপন করেন। কিছুকাল ফয়সালাবাদে অবস্থান করার পর গুজরাঁওয়ালার কুনওয়ালে স্থানান্তরিত হন। ২রা জুন, ১৯৭৪ সনে আহমদীয়তের বিরুদ্ধবাদীরা উভয় ভাই মুহাম্মদ রমযান সাহেব এবং মুহাম্মদ ইকবাল সাহেবকে প্রতারণার মাধ্যমে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যায়। গ্রামের নিকটে এক জায়গায় উভয় ভাইকে গুলি করে শহীদ করে দেয়। অতঃপর তাদের লাশ নদীতে ফেলে দেয়। শহীদ মুহাম্মদ রমযান সাহেবের লাশ তো পাওয়া গেছে কিন্তু শহীদ মুহাম্মদ ইকবাল সাহেবের লাশ অনেক চেষ্টার পরও পাওয়া যায় নি (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন)।

শহীদ গোলাম কাদের সাহেব পিতা রওশন উদ্দিন সাহেব ও চৌধুরী এনায়েতউল্লাহ সাহেব পিতা ফযল উদ্দিন সাহেব গুজরাঁওয়ালার অধিবাসী। শাহাদতের তারিখ ২রা জুন, ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ। মোকাররম গোলাম কাদের সাহেবের পিতা রওশনউদ্দিন সাহেব গুজরাঁওয়ালা শহরে বসতি স্থাপন করেন। চার ভাই এর মধ্যে তিনি একাই আহমদী ছিলেন। গোলাম কাদের সাহেবের বিবাহ গুজরাঁওয়ালা পিরীগিরীতে হয়। তাঁর স্ত্রী তাঁর জীবদ্দশায়ই একটি ঘাতক রোগে মৃত্যুবরণ করেন। সেই সময় তিনি গুজরাঁওয়ালায় কানাগলীতে বাস করছিলেন।

শাহাদতের ঘটনা ঃ শহীদের ছেলে খালেদ মাহমুদ বর্ণনা করেন, একদিন মিছিল আসে কিন্তু পিতামহ ঘরে ছিলেন না। মানুষ মিছিলকে ফিরত পাঠিয়ে দেয়। শহীদ যখন এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন তখন তিনি থানায় গিয়ে পুলিশকে অবহিতও করেন। থানার কর্মকর্তা তাঁর সঙ্গে এসে গ্রামের এক কসাই যে বদমায়েশ এবং আহমদী বিরোধী ছিল তাকে ধমকিয়ে এ নিশ্চয়তা দিয়ে ফিরে যায় যে, এখন আপনাকে আর কেউ কিছু বলবে না। শহীদের ঘরের হেফাযতের জন্য একজন দারোগাকে দায়িত্ব দেয় সে-ও তার নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা দেয় যে, আপনি চিন্তিত হবেন না। রাতে পুলিশের লোক সিভিল পোশাকে আসবে আর আপনার হেফাযত করবে কিন্তু সারা রাত কেউ আসে নি। সেই রাতেই ভাড়াটে পেশাদার হত্যাকারীর একটি দল দুই আহমদীকে অন্যত্র শহীদ করে এসে প্রথমে চৌধুরী এনায়েতউল্লাহ্ সাহেবের নিকট আসে আর তাঁকে ধরে সাথে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন থানায় যায় তার ঘর কোন্‌টি ? খুনীরা তাঁকে সাথে করে নিয়ে এসে শহীদ গোলাম কাদেরের ঘর চিহ্নিত করে আর খুনীদের নির্দেশে শহীদ এনায়েতউল্লাহ সাহেব শহীদ গোলাম কাদেরের দরজায় কড়া নাড়ে। সেহরীর সময় ছিল, গোলাম কাদের সাহেব জিজ্ঞেস করে কে ? উত্তরে বলেন, আমি এনায়েতউল্লাহ্। তিনি নির্দ্বিধায় দরজা খুলে দেন। গোলাম কাদের সাহেব বাহিরে আসতেই খুনীরা তাঁকে ঘিরে ফেলে। উভয়কে (অর্থাৎ গোলাম কাদের এবং এনায়েতউল্লাহ্ সাহেবকে) জোর করে গ্রামের বাহিরে নিয়ে গিয়ে ক্ষেতে শহীদ করে (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শহীদ গোলাম কাদের সাহেবের উত্তরসূরী হিসাবে তিন ছেলে এবং তিন মেয়ে রেখে গেছেন। তাঁর এক ছেলে গুজরাঁওয়ালাতে থাকেন। এ ছাড়া বাকী সন্তানরা রাবওয়াতে অবস্থান করছেন। মোকাররম শহীদ এনায়েতউল্লাহ্ সাহেব কাদিয়ানের নিকটে খাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা ফযল উদ্দিন সাহেব আর মা মোহতারমা সিরাজ বিবি সাহেবা খুব নেক এবং নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। শহীদ উত্তরসূরীদের মধ্যে বিধবা হাফিযা বিবি সাহেবা এক ছেলে মুহাম্মদ আনওয়ার এবং দুই মেয়ে নাদিম আক্তার এবং কদিসার পারভীন সাহেবাকে রেখে গেছেন। ছোট ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় আর বাকী পরিবার রাওয়াতে বসবাস করছেন।

মুহাম্মদ ইলিয়াস আরেফ সাহেবের শাহাদত। তিনি ১০ই অক্টোবর, ১৯৪৫ মোকাররম মাষ্টার ইব্রাহীম শাদ সাহেবের ঘরে শেখুপুরার মুমেন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রারম্ভিক শিক্ষা ১১৭ নম্বর চক বহরে গ্রহণ করেন। অতঃপর ইসলামীয়া কলেজ খানেওয়াল থেকে ইন্টারমেডিয়েট ও ডিগ্রী সম্পন্ন করেন।

শাহাদতের ঘটনা ঃ ১৯৭৪ সালের বিরোধিতার সময় তিনি ওয়াহ্‌কেন্টে ছিলেন। টেক্সেলাতে যখন আহমদীয়তের বিরোধিতা প্রচন্ড আকার ধারণ করে তখন সেখানে ভাড়াটে সন্ত্রাসী এবং খুনীদের মধ্যে অস্ত্র বিতরণ করা হয়। আহমদীদের ঘর চিহ্নিত করা হয়। শহীদ মুহাম্মদ ইলিয়াস আরেফা সাহেবের ঘরও চিহ্নিত করা হয়। ৪ঠা জুন, ১৯৭৪ সনে তিনি তাঁর ছোট ভাই মুহাম্মদ ইসহাক সাদেক সাহেবের সংগে স্ত্রী সন্তানদের গ্রামে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। সকাল ৭টায় টেক্সেলা থেকে বাসে বসিয়ে দেন, তারপর ঘরে গিয়ে নাস্তা করেন, সাইকেল নেন এবং ঘরে তালা লাগিয়ে চাবি ঘরের মালিককে দিতে গিয়ে বলেন ৩/৪ টার সময় ফিরে আসব। ঘর থেকে কেবল ১.৫ ফার্লং দূর যেতেই দেখেন সেখানে তিনজন মৌলভী এবং একজন ভাড়াটে খুনি তাক লাগিয়ে বসা আছে। মৌলবীরা ঐ ভাড়াটে খুনীকে ইংগিত দেয়, সে অনুযায়ী রাইফেল দিয়ে গুলি করে। গুলি শহীদ মরহুমের বুকে বিদ্ধ হয়, আর তিনি ঘটনাস্থলেই শাহাদতের পেয়ালা পান করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শহীদকে প্রথমে চক বাহুরে দাফন করা হয় অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহঃ)-এর অনুমতিক্রমে ১৯৭৫ সনে তাঁর শবাধার রাবওয়ায় আনা হয় আর শহীদদের মকবেরায় দাফন করা হয়। শহীদ মরহুম এক মেয়ে এক ছেলে আর বিধবা স্ত্রী রেখে গেছেন। মেয়ের বিবাহ হয়ে গেছে আর ছেলে আতাউল কাইয়ুম আরেফ বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় বাস করছেন। শহীদের স্ত্রী সুরাইয়া বেগম সাহেবা বর্ণনা করেন যে, আমাকে আমাদের (ভাড়া) বাড়ীর মালিক গযল খান সাহেব বলেছেন যে, শহীদ মরহুমের শাহাদতের কিছুকাল পর হত্যাকারীকে একটি পাগলা কুকুরে কামড়ায় যার কারণে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে আর কুকুরের ন্যায় কেউ কেউ করতে থাকে। এক মাস পর ঘরের মানুষরা তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলে। ৩/৪ দিন পর সে আল্লাহ্‌র আযাবের শিকার হয়ে ঐ অবস্থাই মারা যায়।

শহীদ মোকাররম নিকাবশাহ্ মু'মিন সাহেব পিতা মুহাম্মদ শাহ মারদানের অধিবাসী। শাহাদতের তারিখ ৮ জুন, ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ। তিনি 'বাঝিখেইল'-এর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ শাহ্ ছিল। তিনি আহমদী ছিলেন। তবে শহীদের দাদা লাহোরী জামাতের আহমদী ছিলেন।

শাহাদতের ঘটনা ঃ নিকাব শাহ্ মুমিন সাহেবকে ৮ জুন, ১৯৭৪ সনে পেশোয়ারের ভিতর বেলা ১টায় সাইকেলে যাওয়ার সময় ৪৫ বৎসর বয়সে শহীদ করা হয় (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন)। তিনি

শিক্ষক ছিলেন আর শিক্ষক সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি মোকাররম আলতাফ খান সাহেবের জামাতা ছিলেন। শহীদকারী বাহ্যতঃ তাঁর বন্ধু ছিল। যখন কেউ হত্যাকারীকে ধরার চেষ্টা করে তখন সে বল্‌ল যে, কাদিয়ানী ছিল মেরে ফেলেছি। আমার পিছু নেয়ার চেষ্টা করো না। শহীদের কোন সন্তান ছিল না। স্ত্রী এখনো জীবিত আছেন আমেরিকায় চলে গিয়েছেন।

শহীদ সুবেদার গোলাম সারোয়ার সাহেব এবং তাঁর ভাতিজা **শহীদ আসবার আহমদ খান সাহেব টোপি**, জিলা মরদানের অধিবাসী। শাহদতের তারিখ ৯ই জুন, ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ। সুবেদার গোলাম সারোয়ার সাহেবের পৈতৃক গ্রাম মেনি যা টোপি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তিনি পাকিস্তান আর্মিতে গোয়েন্দা বিভাগের এরিয়া অফিসার ছিলেন। টোপিতে যখন অবস্থা খারাপ হচ্ছিল তখন বন্ধু তাকে বলে যে, মানুষ আপনাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে নিয়েছে এজন্য আপনি অন্যত্র কোথাও চলে যান। তিনি তাকে জবাব দেন যে, আমি যদি সত্য ধর্মের জন্য শাহদত লাভ করতে পারি তাহলে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে ?'

শাহাদতের ঘটনা ঃ ৯ই জুন, ১৯৭৪ সনে টোপির মহল্লা খোশাল আবাদে সন্ত্রাসীরা হত্যা রাহাজানি এবং আগুন লাগানোর বাজার গরম করে রেখেছিল। সেই দিন আটজন আহমদীকে শহীদ করা হয়। আর ৭০ সত্তরেরও বেশি ঘর, মুদির দোকান এবং বাংলো ধ্বংস করা হয়। তিনি এবং তাঁর জাতিজা আসরার আহমদ ঘরেই ছিলেন। তাদের ঘরের পিছন দিকে অবস্থিত কবর স্থান থেকে উত্তেজিত মিছিল আক্রমণ করে। যদিও তিনি হেফাযতের পূর্ব ব্যবস্থাস্বরূপ গুলি করে তাদের ভীত করেন কিন্তু আক্রমণকারীরা সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল। তাদের মধ্য থেকে এক আক্রমণকারী তাঁকে গুলি করে, এতে তিনি ঘটনাস্থলেই শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শাহাদতের পরে ঐ দুর্ভাগারা তাঁর প্রাণহীন শরীরকে গুলিতে ঝাঁজরা করে দেয়। তাঁকে টেনে হিঁচরে সরু পথের চৌরাস্তায় নিয়ে আসে। পাথর মেরে নির্দয়ভাবে দলিত করে এবং নিজেদের ধারণায় (লাশকে) বিকৃত করে দেয়। তিনি মুসী ছিলেন কিন্তু অবস্থার ভয়াবহতার প্রেক্ষিতে তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়। কিছু কাল পর তাঁর ভাই মোকাররম আহমদ জান খান সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহঃ)-এর খেদমতে শহীদের লাশ রাবওয়া বেহেশ্‌তি মকবেয়ার দাফনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। হুযূর (রাহঃ) জবাব দেন, "শহীদ যেখানে দাফন হয় সে স্থানই তার জন্য জান্নাত হয়ে থাকে। এক সায় আসবে যখন এই শহীদের রক্ত সাফল্য বয়ে আনবে। মানুষ বলবে এরা সৌভাগ্যবান। কেননা, আহমদীয়তের জন্য আত্মোৎসর্গের সৌভাগ্য লাভ করেছেন।" অবশ্য হুযূর বেহেশ্‌তী মকবেরাতে তাঁর স্মৃতিফলক লাগাবার অনুমতি দেন। যা বাস্তবায়িত হয়েছে। শাহাদতের সময় তাঁর বয়স ৫২ বৎসর ছিল। তাঁর বিধবা স্ত্রী বর্তমানে রাবওয়াতে নিজের সন্তানদের সাথে অবস্থান করছেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে তিন ছেলে তিন মেয়ে রয়েছে। বড় ছেলে আফতাব আহমদ খান সাহেব পরিবারে জীবিকা নির্বাহের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থান করছেন। দ্বিতীয় ছেলে মোকাররম আনোয়ার আহমদ খান সাহেবও বিবাহিত। পরিবার-পরিজনসহ রাবওয়াতে অবস্থান করছেন। 'খান বাবা সুপার ষ্টোর' নামে গার্মেন্টস এবং জেনারেল ষ্টোরে তিনি কাজ করেন। তৃতীয় ছেলে ছিলেন মোকাররম আমীন আহমদ খান সাহেব। মেয়েদের নাম এরূপ ঃ মোকাররমা রসূল বেগম সাহেবা স্বামী মোকাররম মুহাম্মদ ইকবাল খান সাহেব। জেহ্‌লামের চীফ বোড ফ্যাক্টরীতে চাকুরী করেন। ফরহাদ হুসেইন সাহেব, স্বামী মোকাররম বশীর আহমদ খান সাহেব তারবেইলাতে নিজের ব্যবসা করছেন। মোকাররমা আমাতুল মুজীব সাহেবার স্বামী এজাজ আহমদ খান সাহেব রাওয়ালপিন্ডিতে বেসরকারী চাকুরী করেন। যে ব্যক্তি তাঁকে হত্যা করেছে তার উপর-১৯৭৪ এর জুলাই এর ৩য় সপ্তাহে বজ্রপাত হয়, আর সেখানেই সে জ্বলে ছাই হয়ে যায়। শহীদের আপন জাতিজা মোকাররম আসরার আহমদ খান সাহেবকেও তাঁর সঙ্গে শহীদ করা হয়। তিনি আলহাজ্জ সুলতান সরোয়ার খান সাহেব টোপি, জিলা মরদানের অধিবাসী-এর পুত্র ছিলেন। শাহাদতের কিছু কাল পূর্বে শহীদ তাঁর পিতামহের সঙ্গে হজ্জে বায়তুল্লাহ্‌র সৌভাগ্য লাভ করেন। শাহাদতের পর তাঁর মেট্রিকের ফলাফল ঘোষণা হয়। শাহাদতের সময় বয়স ১৬/১৭ ছিল। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

কানের কাছে পিস্তলের গুলিতে তার শাহাদত হয়। শাহাদতের পর তাঁকে প্রস্তাঘাত করা হয়। ছরিকাঘাত করা হয়। শেষে মিছিল অতীত যুগের শহীদদের স্মরণ করিয়ে দেয়, তাঁর দুই পা দুদিকে টেনে তার লাশকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলে। একজন মহিলা এই নির্মম হৃদয় বিদারক রক্ত-উল্লাস সহ্য করতে না পেরে উচ্চ স্বরে চিৎকার এবং বদ্‌দোয়া দিতে থাকেন। এতে খুনীরা রাইফেলের বাঁট তাঁর দিকে ফেরায়, কিন্তু কতক ব্যক্তি সামনে দাঁড়িয়ে বলে এ কাদিয়ানী নয়। শহীদ আজগর আহমদ খানকে তাঁর চাচা শহীদ সুবেদার গোলাম সরোয়ার সাহেবের সাথে টোপিতেই দাফন করা হয়। তাঁর উত্তর-সূরীদের মধ্যে পিতা মোকাররম আলহাজ্জ সুলতান সরোয়ার খান সাহেব এখন মৃত। মা আমাতুল ওয়াদুদ সাহেবা ছাড়া তিন ভাই পাঁচ বোন রয়ে গেছেন। মা রাবওয়ায় বসবাস করছেন। বড় ভাই মোকাররম আবরার খান সাহেব স্বপরিবারে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাস করছেন। দ্বিতীয় ভাই মোকাররম যোবায়ের আহমদ খান সাহেবও বিবাহিত এবং স্বপরিবারে জার্মানীতে বাস করছেন। তৃতীয় ভাই মোকাররম আসরার আহমদ খান সাহেব অবিবাহিত ইন্টারমেডিয়েটের ছাত্র। তিনি ভাইয়ের শাহাদতের পর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাতা শহীদ পুত্রের স্মরণে তার নাম আসারার আহমদ খান ওয়াকার রেখেছেন। পাঁচ বোনই রাবওয়ায় বাস করছেন। তাদের নাম এরূপ মোকাররমা আমাতুল আখি সাহেবা রিয়াজ আহমদ খান সাহেবের স্ত্রী। মোকাররমা ইয়াসমীন কাওসার সাহেবা তাহের আহমদ খান সাহেবের স্ত্রী, মোকাররমা আছিয়া সুলতানা সাহেবা আনোয়ার আহমদ খান সাহেবের স্ত্রী। মোকাররমা ফারযানা নামায সাহেবা আরেফ আহমদ খান সাহেবের স্ত্রী, মোকাররমা ফাহ্‌মিদা নায সাহেবা অবিবাহিতা, ডিগ্রীর ছাত্রী।

শত্রুর পরিণাম ঃ অ-আহমদী প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনানুযায়ী যে ব্যক্তি আসরার আহমদ খান সাহেবের সাথে পৈশাচিক আচরণ করেছিল। সে ঐ রাতেই পাগল হয়ে যায় ও পাগলা গারদে বন্দী করা হয়। তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে আর তাকে সব সময় ঘরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়।

মোকাররম সৈয়দ মাওদুদ আহমদ বুখারীর শাহাদত। এখন সময় হয়ে গিয়েছে এগুলিকে আগামী খুৎবায় ইনশাআল্লাহ্ বর্ণনা করা হবে।

অনুবাদ - **মাওলানা বশীরুর রহমান**, সদর মুরব্বী

জুমুআর খুতবা

আহমদী শহীদগণের স্মরণে

ধর্মপ্রাণ আহমদীগণ যাঁরা ধর্মের খাতিরে প্রাণ দিয়েছেন তাঁরাতো শহীদ হয়েছেন। আর যারা এদের শহীদ করেছিল সরকার তাদের বিচার না করলেও আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তাদেরকে কেউ বাঁচাতে পারে নি।

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত ২রা জুলাই, ১৯৯৯ মসজিদে ফযল, লন্ডন]

তাশাহ্‌হুদ তা'আওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা বাকারার ১৫৪-১৫৫ নং আয়াত অনুবাদ সহ পাঠ করে বলেন, আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের জন্যে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়েছেন তাদের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে যাচ্ছি। আজ তৃতীয় খিলাফতের যুগের আরও কয়েকজন শহীদের বিবরণ দিয়ে চতুর্থ খেলাফতের যুগের শহীদদের পরিচিতি আরম্ভ করব।

মালেক মুহাম্মদ আনোয়ার সাহেব ইবনে মালেক মুহাম্মদ শফী সাহেব ২২শে আগষ্ট, ১৯৭৮ইং তারিখে শাহাদত বরণ করেন। শহীদ মালেক আনোয়ার সাহেব ১৯৪৫ ইং সনে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন। তাঁর দাদা মালেক মুহাম্মদ বুড্ডা সাহেব মসীহ্‌ মাওউদ (আইঃ)-এর সাহাবী ছিলেন। দেশ বিভাগের পর পিতা মুহাম্মদ শফী সাহেব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত ছিলেন। শাহাদত বরণের সময় তিনি ও তাঁর পিতা-মাতা সকলেই গ্রাম চক নং ৪৫ সাংলাহিল জেলা, শেখোপুরায় বসবাস করছিলেন। শহীদ মালেক মুহাম্মদ আনোয়ার সাহেব তবলীগের জন্যে বড়ই উৎসাহী ছিলেন। নিজ গ্রামের মাস্টার রানা মুহাম্মদ লতীফ সাহেব তাঁর তবলীগে আহমদী হয়ে গেলে সবাই বিরোধিতা আরম্ভ করে দেয়। ২২শে আগষ্ট, ১৯৮৭ ইং বরকতময় রমযানের ১৭ তারিখ সকালে শহীদের চাচা গয়ের আহমদী মালেক মুহাম্মদ রমযান সাহেব শহর থেকে ঔষধ নিয়ে আসছিলেন। রাস্তায় তার উপর শত্রুরা আক্রমণ করে। কিন্তু তিনি ঘোড়ার গাড়ীতে থাকার কারণে সামান্য আঘাত পান। বিরোধীরা লাঠি-সোঁটা নিয়ে আক্রমণ করেছিল, তার পিছনে ধাওয়া করে আসলে মালেক মুহাম্মদ আনোয়ার সাহেব এবং তাঁর পিতা বাইরে চিৎকার শুনে বাড়ীর বাইরে ঘটনা কী তা জানার জন্যে আসেন। আক্রমণকারীরা তখন চাচাকে ছেড়ে দিয়ে মালেক মুহাম্মদ আনোয়ার ও তাঁর পিতার উপর আক্রমণ চালায়। শহীদ গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে আক্রমণকারীরা উল্লাস করতে করতে চলে যায় আর বলতে থাকে যে, একজন মির্যায়ীকে তো শেষ করেছি আর একজন বেঁচে গেল। আনোয়ার সাহেবকে দ্রুত সাংলাহিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ফয়সালাবাদ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ডাঃ ওয়ালী মুহাম্মদ সাহেব অপারেশন করেন। কিন্তু পূর্বেই জখম মারাত্মক হওয়ার কারণে তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয় নি। শাহাদত বরণের সময় তাঁর বয়স ৩৪ বছর ছিল (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। পিতা মুহাম্মদ শফী সাহেবও গুরতর আহত হন। কিন্তু শাহাদত বরণ তাঁর ভাগ্যে ছিল না তিনি বেঁচে গেলেন এবং ছেলে শাহাদতের মর্যাদা পেয়ে গেলেন। শহীদের স্ত্রী সিদ্দীকা বেগম এবং পুত্র মুহাম্মদ সারওয়ার পিতা মুহাম্মদ শফী সাহেব মহল্লা দারুল উলুম শারকী, রাবওয়ায় বসবাস করেন।

মৌলভী নূর আহমদ পিতা আহমদ দীন সাহেব, জেলা ইসলামাবাদ ভারতের কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। ৫ই এপ্রিল, ১৯৭৯ ইং শাহাদত বরণ করেন। মৌলবী নূর আহমদ সাহেব জন্মসূত্রে আহমদী ছিলেন। প্রাইমারী পাশ করে কাদিয়ানে গিয়ে মাদ্রাসা আহমদীয়াতে ভর্তি হন। ১৯৩৭ ইং মৌলবী ফাযেল পাশ করে কাশ্মীরে এসে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। কাঠোয়া এবং কিস্তোয়ায়-এর দুর্গম অঞ্চলে দীর্ঘকাল সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শেষের দিকে নিজের গ্রামের নিকটতম গ্রামে 'মনস্‌গ্রামে' শিক্ষকতা করে অবসরপ্রাপ্ত হন। অবসর গ্রহণের পর নিজের বাড়ীতে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং নিজ সংসারের হাল ধরেন। ১৯৭৮ ইং সনে জলসায় অংশ গ্রহণের জন্যে কাদিয়ান এসেছিলেন। কিন্তু ভাগ্নের আকস্মিক মৃত্যুর কারণে শীঘ্রই ফেরৎ চলে যান। তিনি কাশ্মীর পৌছা মাত্র কয়েকদিন পরে ৪ঠা এপ্রিল পাকিস্তান সরকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিলে ঐ অঞ্চলে জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং আক্রমণ আরম্ভ হয়ে যায়। ৫ই এপ্রিল আক্রমণের দিক পরিবর্তিত হয়ে বা পরিববর্তন করে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো আরম্ভ হয়। মৌলভী নূর আহমদ সাহেবের গ্রাম কোরেলের অধিকাংশই আহমদী এবং কয়েক ফার্লং দূরে আসুর গ্রাম অনেক বড় গ্রাম। সেখানেও সবাই আহমদী ছিলেন। ৫ এপ্রিল, ১৯৭৮ইং দিন দুপুরে হাজার হাজার মানুষ কোরেল গ্রামে প্রবেশ করে প্রায় ১৫টি বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করে লুটপাট ও মারধর করে। মৌলভী নূর আহমদ সাহেব এবং তাঁর দুই ছেলে মাসুদ এবং শামীম আহমদ একত্রে বাড়ীর উপরে তিন তলার ছাদের উপর থেকে আক্রমণকারীদের উপর ফায়ারিং আরম্ভ করেন। ফায়ারিং এর সময় আক্রমণকারীরা সরে দাঁড়ায়, তারপর আবার আক্রমণ করে। এভাবে বিকাল সাড়ে চারটার দিকে আক্রমণকারীরা বাড়ীতে প্রবেশ করে। সম্ভবতঃ মৌলভী সাহেবের নিকট বন্দুকের গুলি শেষ হয়ে গিয়েছিল। আক্রমণকারীরা বাড়ীতে প্রবেশ করলে মৌলভী সাহেবের ছেলেরা কোনভাবে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু মৌলভী সাহেবকে তারা ধরে ফেলে এবং বাড়ীর উঠানে ফেলে পাথর মেরে মেরে শহীদ করে দেয়। আক্রমণকারীরা লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। এদের মধ্যে অনেকেই মৌলভী সাহেবের ছাত্রও ছিল (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শহীদ মৌলভী নূর আহমদ সাহেব দুই ছেলে মাসুদ আহমদ ও শামীম আহমদ এবং বিধবা স্ত্রী ও এক কন্যা রেখে গেছেন। ঐ তারিখে কাশ্মীরে আরো অনেক গ্রামে আহমদীদের উপর আক্রমণ ও লুটপাট করা হয়েছিল। বেশ কয়েকটা মসজিদও শহীদ করা হয়েছিল।

বশীর আহমদ রশীদ সাহেব শ্রীলংকার অধিবাসী ২৭শে জুন, ১৯৭৯ ইং তারিখে নিজ শহরে শহীদ হয়েছিলেন। মুকাররম বশীর আহমদ

রশিদ সাহেব মুকাররম জোযে বশীর আহমদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। দাদা জামাল উদ্দিন সাহেব প্রথমে আহমদীয়ত গ্রহণ করেছিলেন। নেগোম্বে জামাতের প্রবীণ আহমদী ছিলেন। ১৯৭৮ইং সনে শ্রীলংকায় আহমদী বিরোধী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল। মৌলভীরা বড় বেশী বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছিল। আহমদীদের উপর আক্রমণ হতে থাকে অনেক আহমদীর বাড়ী-ঘর জ্বালানো হয়, আহমদী মসজিদেও আগুন দেয়া হয়। এই অবস্থা প্রায় এক বছর ধরে চলতে থাকে। বশীর আহমদ রশিদ সাহেব ঐ দিন নামাযে ইশার পর দু'জন সহ মসজিদ থেকে বাড়ী আসছিলেন। রাস্তায় চারজন আক্রমণকারী তাঁর উপর আক্রমণ করে। চাকু দ্বারা প্রায় ১৮ টা আঘাত করা হয় এবং মুকাররম বশীর আহমদ রশিদ সাহেব ঘটনাস্থলেই শাহাদত বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শাহাদত বরণের সময় তাঁর বয়স মাত্র ২২ বছর ছিল। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর মা এখনও জীবিত আছেন। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করা হয়। কিন্তু ফয়সালা তাদের পক্ষে হয়ে যায়; কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তারা রক্ষা পায় নি। একজন চলন্ত গাড়ীর নীচে পড়ে মারা গিয়ে লাশ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। অপর একজনকে তার নিজের সঙ্গীরাই চাকু মেরে হত্যা করে রেল লাইনের উপর ফেলে রাখে। অপর আরো দু'জন পাগল হয়ে গিয়ে পাগলাগারদে এবং হাসপাতালে থাকে অনেকদিন। এরা দু'জন এখনও জীবিত। কিন্তু এত খারাপ অবস্থা যে, না মৃত না জীবিত।

হযরত মুন্সী এল্‌মদীন সাহেব কোটলি আযাদ কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। ১৩ই আগষ্ট, ১৯৭৯ ইং শহীদ হন। হযরত মুন্সী সাহেব ১৯৩৪ ইং সনে অনেকে পড়াশুনা ও বুঝা শোনার পর আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। আহমদীয়ত গ্রহণের পূর্বে থেকেই কাদিয়ান বার্ষিক জলসায় অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কিতাবাদি পড়া-শুনা ও হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর খুতবা বক্তৃতা শুনতে থাকেন। আহমদীয়তের পূর্বে তিনি কঠোরভাবে 'আহলে হাদীস' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আদালতের দলীল লেখার পেশা অবলম্বন করেছিলেন এবং তবলীগের কাজে বড় অগ্রগামী ছিলেন। অনেকসময় তাঁর নিকট যারা দলীল লিখতে আসতো তাদেরকে তিনি বলতেন, আল্ ফযলের এই পৃষ্ঠাটা যদি পড়ে দাও তবে তোমার দলীল লেখার খরচটা নিব না। শহীদ হওয়ার আগের রাত সারারাত ইবাদতে কাটিয়েছিলেন। ১৩ই আগষ্ট, ১৯৭৯ইং সকাল ৯:৩০ মিঃ সময় তিনি আদালতের দিকে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় শত্রুরা তাঁর গলা কেটে ফেলে দেয় আর এভাবে তিনি শাহাদত বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ হয়েছে। হত্যাকারীদের আত্মীয়-স্বজনরা আসামীদেরকে চেষ্টা করে জেল থেকে হাসপাতালে নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র তকদীর অটল ছিল, হত্যাকারীদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে পাগল হয়ে যায়। নিজ পরিবারের এবং পুরো অঞ্চলের জন্যে আতংকের কঠিন পরীক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।পরিবারের লোকেরা তাকে তালা বন্ধ করে রেখেছিল কিন্তু একসময় অপারগ হয়ে বিভিন্ন উপায়ে ঐ পাগলের কর্মকান্ড থেকে দায়মুক্ত হবার উপায় বের করে এবং পাগলকে ছেড়ে দেয়। হত্যাকারীটি পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। আহমদী দোকানদারদের দোকানের সামনে হাত জোড় করে অনেক অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকত। সম্ভাবতঃ বিবেকের দংশনের কারণে অথবা আল্লাহ্‌র আযাবের কারণে এমন করত। অবশেষে সাত বছর এগার মাস কুড়ি দিনের মাথায় হত্যাকারী ৩রা মার্চ মাদক দ্রব্য সেবন করে আত্মহত্যা করে। প্রত্যেক সভায় এলাকাবাসী এই হত্যাকারীর পরিণামকে আল্লাহ্‌র গযব বলেই বিশ্বাস করেছে। আল্লাহ্‌র আযাবের নিদর্শন হয়ে গেছে। তার বংশধরেরা একেবারে ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে গেছে। পিতা বার্ধ্যক্যে ও যুবক সন্তানের মৃত্যুর কারণে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। সমস্ত পরিবারই আল্লাহ্‌র ক্রোধের শিকারে পরিণত হয়েছে।

শহীদ চৌধুরী মকবুল আহমদ সাহেব 'পন্নু আকেল' সিন্ধুর অধিবাসী ছিলেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ ইং শহীদ হয়েছেন। চৌধুরী মকবুল আহমদ শহীদের স্ত্রী বর্ণনা করেছেন, তাঁর স্বামী শহীদ মকবুল আহমদ সাহেব ১৯৬৭ইং সনে বয়াত হয়েছিলেন। আহমদী হওয়ার কারণে মৌলভীরা সর্বদাই তাকে কষ্ট দিত। হুমকী দিত। রাতে বাড়ীর উপর পাথর ফেলত। দরজায় কড়াঘাত করত। তিনি কাঠের ব্যবসা করতেন। একদিন এক ব্যক্তি কাঠ কেনার ওজুহাতে এসে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করতে করতে শেষ করে দেয় এবং তিনি ঘটনা স্থলেই শহীদ হন। শাহাদতের ঘটনার পর শ্বশুর পক্ষ তাঁর স্ত্রীর উপর চাপ সৃষ্টি করে যে, স্ত্রী যদি আহমদীয়তকে প্রত্যাখ্যান করেন তবে তারা তাকে আশ্রয় দিবে। ধমক দিতে থাকে যে, তুমি আহমদীয়ত ছেড়ে দাও। কিন্তু স্ত্রী তাচ্ছিল্যের সাথে তাদের চাপকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলে দেন যে, যা করতে পার কর আমি কোনক্রমেই আহমদীয়ত ছাড়ছি না কারণ আহমদীয়তের কারণেই আমার স্বামীকে তোমরা হত্যা করেছ। শহীদ তাঁর বিধবা স্ত্রী দুই পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। শহীদের বড় ছেলে আতীকুর রহমান অষ্ট্রেলিয়া বাস করছেন। তিনি বিবাহিত। বড় মেয়ে বিবাহিত। অন্যরা মায়ের সাথে জেলা টোবাটেক্‌সিং এ বাস করছেন।

এতক্ষণ তৃতীয় খেলাফতের যুগের শহীদগণের বিবরণ দিচ্ছিলাম। এবার চতুর্থ খেলাফতের যুগের শহীদদের বিবরণ আরম্ভ করছি।

মাস্টার আব্দুল হাকীম আবড়ো সাহেব ওয়ারা [জেলা লাড়কানা সিন্ধু প্রদেশ] জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৬ই এপ্রিল, ১৯৮৩ ইং তিনি নিজ গৃহে শহীদ হন। মাস্টার আব্দুল হাকীম আবড়ো সাহেব চতুর্থ খেলাফতের যুগের প্রথম শহীদ এবং সিন্ধি জাতির আহমদীদের যুগের প্রথম শহীদ। ১০ই এপ্রিল, ১৯৩২ ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে তিনি বড় হন। বাল্যকালেই তাঁর পিতা মারা যান। চাকুরীরত অবস্থায় তিনি সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, এম এড পাশ করেন। কুরআন শরীফের সাথে তাঁর গভীর প্রেম ছিল। তাঁর বাড়ীতে সকালে কুরআন তেলাওয়াত না করে কেউ নাস্তা করার অনুমতি পেত না। তবলীগের জন্যে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তবলীগের কোন সুযোগই তিনি হাতছাড়া করতেন না। এমন কি অনেক সরকারী অফিসেও জামাতের পত্রিকা তিনি জারী করে রেখেছিলেন। খেলাফতের সাথে বড় গভীর সম্পর্ক ছিল। বার বার মরকযে আসতেন। অন্যদেরও উৎসাহ দিতেন। কোন কোন ব্যক্তিকে নিজ খরচে মরকযে নিয়ে আসতেন।

১৬ই এপ্রিল রাত দু'টোর সময় দুই ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে। তাদের হাতে কুড়াল ছিল। প্রথমতঃ তারা কেবল মাষ্টার সাহেবকেই আক্রমণ করার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলেন। মাষ্টার সাহেব তখন ঘুমাচ্ছিলেন। আক্রমণকারীরা অবিরত কুড়াল দিয়ে আঘাত করতে থাকে। চিৎকার শুনে বাড়ীর সবাই জেগে যায় এবং তাঁর বড় ছেলে রিয়াজ আহমদ নাসের সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ তখন জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্র ছিলেন। ছুটিতে বাড়ী এসেছিলেন। বড় ছেলে একজনকে ধরে ফেলতে চেষ্টা করলে তাকেও আঘাত করা হয়, ফলে ছেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। স্ত্রীর মাথায়ও কুঠারাঘাত করে তারা। এক কন্যাও আহত হন। আহত অবস্থায় মাষ্টার সাহেব বলতে থাকেন। 'আমার ধর্মমত অবশ্যই সত্য এবং আমি ভীতও নই। আর না আমার পদস্খলন ঘটেছে। হ্যাঁ, আমার

ভাগ্যে শাহাদত আর তোমাদের ভাগ্যে ধ্বংস ব্যতীত কিছুই নেই।' তারপর তিনি উচ্চস্বরে চিৎকার করে সিন্ধি ভাষায় বলেন, "আহমদীয়ত সাচ্চী আহে" [আহমদীয়ত সত্য] 'আহমদীয়ত সাচ্চী আহে'। 'আহমদীয়ত সাচ্চী আহে'। ঐ মরণাপন্ন অবস্থায় বড় ছেলেকে নসিহত করে বলেন, 'আমি বাঁচবো না কিন্তু আহমদীয়ত তোমরা ছাড়বে না। আর না তুমি তোমার ওয়াকফ্ ভাংবে (উৎসর্গ হওয়া জীবন)। আহত হওয়ার এক ঘন্টা পর তিনি ইন্তেকাল করে শাহাদত বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

তাঁর নামায জানাযা 'খাড়ু' নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর জনসেবা-মূলক কাজের জন্যে গয়ের আহমদীরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করত। অনেক গয়ের আহমদী জানাযায় শরীফ হন। তাদের অনেকেই চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন। প্রথমে তাঁকে 'খাড়ুতেই আমানতস্বরূপ দাফন করা হয় এবং পরবর্তীতে ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৮৩ ইং লাশ রাবওয়া আনয়ন করা হয় এবং বেহেশ্‌তী মকবেরায় দাফন করা হয়। পোষ্ট মর্টেম রিপোর্টে তাঁর শরীরের উপর ২৭ টি আঘাত ছিল। কোন কোন ক্ষত ২/৩ ইঞ্চি গভীর ছিল। সকালে যখন তাঁর স্কুলের ছেলেরা খবর পেল তখন তারা শোক মিছিল বের করে এবং শ্লোগান দিয়ে সরকারের নিকট শহীদের হত্যাকারীদের মার্শাল ল কোর্টে বিচারের এবং শাস্তির দাবী জানাতে থাকে। আসামীদেরকে ১৬/১৭ই এপ্রিল পুলিশ গ্রেফতার করে।

শহীদ তাঁর বিধবা স্ত্রী, তিনপুত্র ও চার কন্যা রেখে গেছেন। বড় ছেলে মোকাররম রিয়াজ আহমদ নাসের, মুরব্বী সিলসিলা বিবাহিত। দ্বিতীয় ইমতিয়াজ আহমদ আবড়ো, অষ্ট্রেলিয়ায় আছেন এবং বিবাহিত। বাকী এফতেখার আহমদ আবড়ো ও আব্দুল শামি' আবড়ো এবং দুই মেয়ে তাহমিনা পারভীন এবং আমাতুল আলা ও নুসরতে বারী সাহেবা রাবওয়ায় মায়ের সাথে আছেন। তৃতীয়া মেয়ে বিবাহিত তার স্বামী সাইফুল্লাহ শাহ্ সাহেব ট্রান্স পোর্টের কাজ করেন।

ডাক্তার মুজাফ্‌ফর আহমদ শহীদ আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরে বাস করছিলেন। ৮ই আগষ্ট, ১৯৮৩ ইং শাহাদত বরণ করেন। আমেরিকার মাটিতে প্রথম রক্ত দানকারী শহীদ। ডাঃ মুজাফফর আহমদ সাহেব ১৯৪৬ ইং সনে মহলপুর জেলা হুশিয়ারপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শাহাদত বরণ কালে তাঁর বয়স মাত্র ৩৭ বছর ছিল। পিতার নাম রশিদ আহমদ। তিনি তা'লীমুল ইসলাম কলেজ, রাবওয়া থেকে এফ, এস, সি (এইচ এস সি) পাশ করেন। কিং এডওয়ার্ড কলেজ লাহোর থেকে এম, বি, বি, এস পাশ করেন এবং ১৯৭১ ইং সনে আর্মী মেডিকেল কোরে যোগদান করেন। ১৯৭৫ ইং আমেরিকা যাত্রা করেন। বিভিন্ন হাসপাতালে কাজ করার পরে অবশেষে মিসিগান ষ্টেটের ডেট্রয়েট শহরে কর্মরত হন। তিনি কেবল একজন ভাল চিকিৎসকই ছিলেন না একজন সফল দায়ী ইলাল্লাহ্ বা প্রচারকও ছিলেন। শাহাদতের সময় তিনি আমেরিকার জেনারেল সেক্রেটারী এবং রিজিওনাল কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ছিলেন। খৃষ্টান ধর্মের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। প্রায়ই তিনি তাঁর সহকারী ও সমকর্মীদের সাথে ধর্মীয় আলোচনা করতেন।

১৯৮৩ ইং সনে আমেরিকার বার্ষিক জলসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় ৮/৯ই আগষ্টের মধ্য রাতে ৯.৩০ টার সময় একজন কৃষ্ণবর্ণের ব্যক্তি তাঁর বাসায় এলে তিনি তাকে ঘরে বসিয়ে তবলীগ করতে থাকেন। বৈঠক শেষে তিনি ঐ মেহমানকে বিদায় জানাতে গেটে আসেন। বিদায় দিয়ে যখন পিছন ফিরে বাসার দিকে মুখ করেন তখনই পিছন থেকে ঐ ব্যক্তি তাঁকে গুলি করে বসে। বেশ কয়েকটি গুলি করে। ডাক্তার সাহেব সেই মূহূর্তেই ঘটনাস্থলে শাহাদত বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

কিছুদিন পরে খুনী ব্যক্তি জামাতের কেন্দ্রে বোমা ফেলে ধ্বংস করার চেষ্টা করতে এলে বোমায় নিজেও জ্বলে মরে যায়। ১৫ই আগষ্ট, ১৯৮৩ ইং রাত ২টায় শহীদ ডাঃ মুজাফফরের লাশ করাচী পৌছে এবং ১৬ই আগষ্ট প্রথমতঃ লাহোর অতঃপর চুয়েন্ডা ঘুরে ঐ দিনই রাবওয়া নিয়ে যাওয়া হয়। আমি জানাযা পড়িয়েছিলাম। সন্ধা ছয়টায় তার মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়।

ডাঃ মুজাফফরের শাহাদতের ঘটনা সম্পর্কে পরের (১২ই আগষ্ট) জুমুআর খুতবায় মসজিদে আকসায় (রাবওয়া) আমি বলেছিলাম, "হে ডেট্রয়েট এবং আমেরিকার অন্যান্য শহরের আহমদীরা ! আর যারা আমেরিকার বাইরে আছ ! হে ইসলামের সেনারা যারা পৃথিবীর পূর্ব্বাঞ্চলে বা পশ্চিমাঞ্চলে বাস করছ ! আজ এই সাময়িক শোকে তোমরা বেশী দুর্বল হয়ে পড়ো না। আজকের এই শাহাদত অগণিত আনন্দের পূর্বাভাস মাত্র"। আজ আমি বলছি, আনন্দের কারণ হয়েছে। ঐ সময় পূর্বাভাস বলেছিলাম। পৃথিবীতে আহমদী জামাত যত অগ্রগতি লাভ করেছে এসব ঐ শহীদের কুরবানীর প্রতিফলন। "এই শহীদদের মৃত বলিও না বরং তাঁরা জীবিত। ঐ মহাপুরুষরা এই পথ থেকে সামান্যতমও পিছু হটেন নি বরং অনেক অগ্রসর হয়েছেন। তোমরা যেন এতে দুর্বল না হয়ে পড়। আর না যেন তোমাদের পা কম্পমান হয়। তোমাদের দৃঢ়তা যেন দুর্বল না হয়ে যায়। হে মুজাফফর তোমরা প্রতি সালাম। তোমরা পিছনে লক্ষ মুজাফফর তোমার স্থলভিষিক্ত হওয়ার জন্য অধীর অপেক্ষায় আছেন। হে শত্রুরা ! যারা মুজাফফরকে হত্যা করেছ। তোমরা মুজাফফরকে তো অমৃত সূধা পান করিয়েছ। সেতো এখন অমর হয়ে গেছে। আর মৃত্যু তোমাদের ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে।" শহীদের বিধবা স্ত্রী আছিয়া বেগম ছাড়াও দুই পুত্র রেখে গেছেন। বড় ছেলে স্নেহাস্পদ গজনফর আহমদ সাহেব পিতার শাহাদতের সময় ৪ বছরের ছিলেন। এখন মেরী ল্যান্ড ইউনিভার্সীটিতে কম্পিউটারে ডিগ্রী করছেন। ছোট ছেলে জাফর আহমদ পিতার মৃত্যুর দু'মাস পরে জন্মগ্রহণ করেন। এখন ১৫ বছর বয়স পড়াশুনা করছেন।

শেখ নাসের আহমদ শহীদ উকাড়া শহরের অধিবাসী ছিলেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ ইং তাঁকে শহীদ করা হয়। জনাব শেখ নাসের আহমদ ১৯৪২ ইং সনে মোগা জেলা ফিরোজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ ফযল আহমদ সাহেব। দাদা হযরত দীন মুহাম্মদ সাহেব ১৯০৩ ইং সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে পত্র লিখে বয়াত হয়েছিলেন। পাকিস্তান হওয়ার পরে এই পরিবার 'উকাড়া' শহরে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন। শেখ নাসের আহমদ সাহেব প্রথমতঃ পিতার সাথে পরে পৃথক ব্যবসা আরম্ভ করেন। গ্রাহকরা যারা একবার তার দোকানে আসতেন তারা শেখ নাসের সাহেবের আন্তরিকতায় এবং ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। মরহুম শহীদ জামাতের জন্যে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। খেলাফতের সাথে অত্যন্ত গভীর ভালবাসা রাখতেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ শুক্রবার জুমুআর খুতবায় যখন আমি ডাঃ মুজাফফর আহমদ শহীদ ; ডেট্রয়েট আমেরিকার শহীদের কথা বলছিলাম তখন শেখ নাসের আহমদ সাহেব ঐ খুতবা শুনে খুবই অভিভূত এবং আন্তরিকভাবে শাহাদতের সৌভাগ্য লাভের আশাবাদী হয়ে বলেছিলেন, "এতো ভাগ্যবানদের জন্যে নির্দিষ্ট- এটা এমন জীবন 'শাহাদত' যার কোন বিকল্প নেই।" দুই দিন পরই ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ ইং ঈদুল আযহার নামায আদায় করে বাড়ী ফিরে এসে কুরবানী করতে কসাইয়ের অপেক্ষা করছিলেন। কসাই আসতে দেরী হচ্ছিল দেখে তিনি কসাইকে দেখার জন্যে বাড়ীর বাইরে আসেন। তাঁর বাড়ীর বাইরে আসার সাথে সাথেই মুহাম্মদ আসলাম, নামে এক ঘৃণ্য ব্যক্তি

শেখ নাসেরের পেটে ছুরি মেরে দেয়। রক্ত বের হচ্ছিল। কিন্তু শহীদ শেখ নাসের বুঝতে পারেন নি যে, কত গভীর ক্ষত ছিল। তিনি নিজ হাতে ক্ষত স্থান ধরে রেখে নিকটতম ডাক্তারে কাছে চলে যান। ডাক্তার দেখেই বলে দেন যেন শীঘ্রই হাসপাতালে যান। তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে উকাড়া সেনানিবাসের সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যান। ইতোমধ্যেই প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে যায়। অবশেষে তাঁর শাহাদতের ঘটনা ঘটে যায়। তিনি আত্মীয়দের সাথে কথা বলতে বলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। হত্যাকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করে ফেলে। হত্যাকারী কোর্টে বর্ণনা করে যে, আমি শেখ নাসেরকে আঁ হযরত (সঃ)-এর অবমাননা করতে দেখে ধৈর্যহারা হয়ে খুন করেছি। অথচ হত্যাকারী যখন আক্রমণ করে তার পূর্বে কোন দিন শেখ নাসেরের সাথে তার কোন কথাই হয় নি।

৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫ ইং জনাব মুহাম্মদ ইলিয়াস, এডিশনাল সেশন জজ সাহেব, উকাড়া অভিযুক্ত আসামীকে কেবলমাত্র ৩ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করেন। অধিকন্তু তিনি তার সিদ্ধান্তে লিখেন যে, হত্যাকারী যেহেতু দু'বছর থেকে কারাগারে আছে এই দুই বছর তার শাস্তি থেকে কর্তন হবে।

আমাদের শহীদদের যারা হত্যাকারী তাদের পরিণাম সম্পর্কে কেউ যদি অবগত থাকেন তবে তিনি যেন আমাকে লিখে জানান সেটা আমাদের ইতিহাসে উল্লেখ হয়ে থাকবে। শহীদ শেখ নাসের তাঁর মা স্ত্রী ছাড়া এক কন্যা ও চার পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। পুত্রদের মধ্যে বাবর আহমদ বিবাহিত এবং কাপড়ের ব্যবসা করেন। ডাঃ আমের মাহমুদ সাহেব উকাড়া শহরেই প্রাইভেট প্রাকটিস করছেন। ডাঃ আমের মাহমুদ সাহেব নুসরাত জাহান স্কীমের অধীনে আফ্রিকায় ১৯৯৩ ইং থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ ইং তিন বছর আপাপা লেগোস-এ খেদমত করেছেন। তিনি বিবাহিত কিন্তু সন্তান নেই। আল্লাহ্ এদের সন্তান দান করুন। এখন তিনি নায়েব কায়েদ জিলা এবং খেদমতে খালকের নাযেম হিসেবে কাজ করছেন। জনাব আযহার মাহমুদ নাসের এখনও অবিবাহিত এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পি, এইচ, ডি করতে অষ্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন। লোকমান আহমদ তাহের অবিবাহিত। তিনি উকাড়া শহরেই ক্যামিক্যালস্ এর ব্যবসা করছেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার নাযেম মাল ; নাযেম উমুমী এবং জামাতের সহকারী সেক্রেটারী জায়েদাদ হিসেবে কর্তব্য পালন করছেন। মুকাররমা লুবনা নাসের সাহেবা হোমিও প্যাথি কলেজে শেষ বর্ষের ছাত্রী এবং এখনও অবিবাহিতা। তিনি উকাড়া শহরে লাজনার জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে কর্মরত আছেন। শহীদ মরহুমের বিধবা স্ত্রী উকাড়া জেলা লাজনার নায়েব সদর পদে কর্মরত আছেন।

চৌধুরী আব্দুল হামীদ শহীদ মেহরাবপুর সিন্ধু প্রদেশে বাস করতেন। তাঁকে ১০ই এপ্রিল, ১৯৮৪ ইং তারিখে শহীদ করা হয়। ১৯৪৭ ইং সনে মুলতানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সুলতান আলী। ১৯৫৭ ইং সনে ম্যাট্রিক এবং ১৯৬১ সনে এফ, এস সি (এইচ এস সি) পাশ করেন। তারপর তাঁর পিতার সাথে মেহরাবপুর গিয়ে ব্যবসার কাজে যোগদান করেন। তাঁর পিতা সমস্ত পরিবারের একা আহমদী ছিলেন। আব্দুল হামীদ সাহেব তের বছর বয়সে নিজেও বয়াত হন। শাহাদতের সময় তিনি মেহরাবপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

১০ই এপ্রিল, ১৯৮৪ ইং সকাল ১০টার দিকে তিনি একজন গয়ের আহমদী মৌলভী শাহ মুহাম্মদ সাহেব অসুস্থ থাকার কারণে তাঁকে দেখে আসছিলেন। রাস্তায় পুস্তক বাঁধাই করা দোকানে ছেলেদের পুস্তক বাঁধাই করতে দেয়া হয়েছিল। ছেলেদের পুস্তক বাঁধাই করা হয়েছে কিনা দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে বাঁধাইকারকের সাথে কথা বলে পুনরায় সাইকেলে চড়ে নিজ আড়তের দিকে যাত্রা করছিলেন। সাইকেল চালানো আরম্ভ করা মাত্র পেছন থেকে একজন তাঁকে ডাক দিলেন, "আব্দুল হামীদ সাহেব ! আমার কথা শুনে যাবেন!" আব্দুল হামীদ সাহেব ডাক শুনে সাইকেল থামিয়ে নামবার জন্য পা নীচে রাখছিলেন। ইতোমধ্যে ঐ ব্যক্তি পেছনে এসে পিঠে ছোরা প্রবেশ করিয়ে দেয়! তিনি তাড়াতাড়ি সাইকেল থেকে নেমে বসে পড়েন। আঘাত অনেক গভীর ছিল। তিনি নিজে ছোরা পিঠের মধ্যে থেকে টেনে বের করেন। তাড়াতাড়ি কাছের হাসপাতালে নিয়ে ব্যান্ডেজ করানো হয়। পরে নওয়াব শাহ্ শহরের বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। লোকজন হত্যাকারীকে ঘটনাস্থলেই ধরে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেন। হত্যাকারী বর্ণনা দিতে গিয়ে বলে যে, "আব্দুল হামীদ যেহেতু কাদিয়ানী অতএব, তাকে হত্যা করে আমি জেহাদ করেছি"। মামলা তিনবছর পর্যন্ত চলতে থাকে কোর্টে। রজব আলী সাহেব এডিশনাল সেশন জজ আসামীকে তিন বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করেন। ফয়সালার মধ্যে একথাও লিখেন যে, আসামী ১০ই এপ্রিল, ১৯৮৪ ইং থেকে ১৯ মে, ১৯৮৬ ইং পর্যন্ত সময়টা জেলে ছিল ঐ সময়টা শাস্তি প্রাপ্ত তিনবছরের মধ্যে থেকে বাদ দিতে হবে। এভাবে বাস্তবে আসামীকে কোন শাস্তিই দেয়া হয় নি।

এদিকে জানা যায় যে, শহীদ মরহুম মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বড় ভাই ও পুত্রকে বলে গেছেন যে, আসামী খুনীকে তিনি ক্ষমা করে দিয়ে গেছেন। সুতরাং আসামীর বিরুদ্ধে যেন কোন রকম ব্যবস্থা নেয়া না হয়। তিনি বলে গেছেন যে, "আমি আসামীকে ক্ষমা করার ফলে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করতে যাচ্ছি।"

শহীদ মরহুম খুব হাসি-খুশি ও উত্তম মেজাযের লোক ছিলেন। সকল ইবাদত সুন্দর করে পালন করা ছাড়াও মানুষের মঙ্গল করতেন। এমনকি ইতিহাস থেকেও জানা যায় যে, খুনী ও তার পরিবারের অভাব অভিযোগও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পূরণ করেছিলেন। কিন্তু খুনী মৌলভীদের উস্কানীতে নিজ মেহেরবানকে হত্যা করেছে।

শহীদ তাঁর বিধবা স্ত্রী ছাড়াও দুই কন্যা ও পাঁচ পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। বর্তমানে বড় ছেলে মনোয়ার আহমদ মেহরাবপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট এবং রিজিওনাল কায়েদ খোদামুল আহমদীয়া জেলা শুক্কুর। হাফেয মুহাম্মদ নাসের সাহেব জার্মানীতে আছেন। মুহাম্মদ আহসান সাহেব মেহরাবপুরে বসবাস করছেন। মুজাফফর হাসান ও মুহাম্মদ আসলাম সাহেব হল্যান্ডে বসবাস করছেন। বুশরা ফযিলাত সাহেবা এবং ফরমানুযহাত্ সাহেবা বিবাহিতা এবং সকলেই নিজ নিজ স্থানে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আছেন এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সেবায় নিয়োজিত আছেন।

শহীদ কুরায়েশী আব্দুর রহমান সাহেব শুক্কুর শহরের অধিবাসী ছিলেন। ১লা মে, ১৯৮৪ ইং কুরায়েশী আব্দুর রহমান সাহেবকে শহীদ করা হয়। মুকাররম কুরায়েশী আব্দুর রহমান সাহেব ১৯১১ ইং সনে সিয়ালকোটের দৌলুতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হযরত গোলাম মুহিউদ্দীন কুরায়েশী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবী ছিলেন। কশুর শহরে পড়াশুনা করেন। ১৯৩২ ইং সনে তিনি এফ, এস, সি (এইচ এস সি) পাশ করে রেলওয়ে হাইস্কুল, শুক্কুরে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং এখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পরে তিনি পাঞ্জাবে চলে আসতে চাচ্ছিলেন কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)-এর নির্দেশে শুক্কুরেই থেকে যান। প্রায় ৪৮ বছর কাল তিনি বিভিন্ন পদে থেকে ও ধর্মীয় সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছিলেন। শাহাদতের সময় তিনি শুক্কুর ও শিকারপুর জেলার আমীর ছিলেন। তিনি

অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, নিবেদিতপ্রাণ, ন্যায়পরায়ণ, দয়াময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ সময় আহমদীয়া মসজিদে অতিবাহিত হত। ১লা মে, ১৯৮৪ ইং নামাযে মাগরেব আদায়ের পর বাড়ীতে আসছিলেন। রাস্তায় লুকিয়ে থাকা ৬ জন আক্রমণকারী বর্শা, খন্জর ইত্যাদির সাহায্যে তাঁর উপর নির্মমভাবে আক্রমণ করে। একজন তাঁকে বা দিক থেকে ৩বার আক্রমণ করে। একটি আঘাত তাঁর পেটের উপর লেগে যায়। ফলে নাড়ী-ভূঁড়ি বেরিয়ে যায়। তারপরও তিনি বাড়ীর দিকে যেতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অন্য একজন আক্রমণকারী বল্লম জাতীয় এক অস্ত্র দিয়ে অনেকগুলো আঘাত করতে থাকে। শোরগোল শুনে বাড়ীর মহিলারা বাইরে বেরিয়ে আসে। মোহতরম কুরায়েশী সাহেব মহিলাদেরকে শক্তভাবে বাড়ীর ভেতরে থাকতে আদেশ করেন। হত্যাকারীরা পালিয়ে গেলে মহিলারা তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে আসেন। তাঁর পুত্রবধু তাঁকে পানি পান করাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পানি তাঁর গলার ভিতর পৌঁছানোর পূর্বেই তিনি পরপারে পাড়ি জমান (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। কুরায়েশী সাহেবের হত্যা মামলা পুলিশের কাছে রেকর্ড করা হয়। কিন্তু কোন আসামীকে গেফতার করা হয় নি।

শহীদ মরহুম কুরায়েশী সাহেব ৬জন পুত্র ও দু'জন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। তাঁর বড় ছেলে কুরায়েশী নাসের আহমদ সাহেব এম, এ, প্রফেসর, মুবারক আহমদ মুরব্বী সিলসিলাহ্ পিতার শাহাদতের পরে মারা গেছেন।

কুরায়েশী মনোয়ার আহমদ সাহেব এস, এস, সি, কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা হায়দরাবাদে কর্মরত আছেন। কুরায়েশী রফি আহমদ প্রাক্তন আসীরানে রাহে মাওলা (আল্লাহ্‌র পথে কারাগারে নিক্ষিপ্ত) শুক্কুর শহরে চাকুরী করেন। তার পরিবার রাবওয়া আছেন। কুরায়েশী নঈম আহমদ সাহেব শুক্কুরে সার কারখানায় চাকুরী করেন। কুরায়েশী আরিফ আহমদ সাহেব লাহোরে আছেন। কন্যা নুসরাত ও ফযিলত বেগম বিবাহিতা এবং করাচীতে বসবাস করছেন। সকলেই আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ প্রাপ্তির সাক্ষী হয়ে আছেন।

ডাক্তার আব্দুল কাদের চীনী শহীদ ফয়সালাবাদের অধিবাসী। ১৬ই জুন, ১৯৮৪ ইং শাহাদত বরণ করেন। ডাঃ আব্দুল কাদের [পিতা কারী গোলাম মুস্তাফা সাহেব] প্রাথমিক শিক্ষা রাবওয়া থেকে লাভ করেন। পরে এম, বি, বি, এস পাশ করে একজন বড় চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ফয়সালাবাদে বসবাস করছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। তার সততা ও ভদ্রতার কারণে বড়ই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। অত্যন্ত দায়িত্ববান ছিলেন তিনি। সর্বদা জনসেবায় ব্যস্ত থাকতেন। ১৬ই জুন, ১৯৮৪ ইং দুপুর প্রায় ১২ টায় সময় তিনি পিপুল্‌স কলোনীতে নিজ বাসভবনেই ছিলেন। নঈম উল্লাহ্ হাশেমী নামক এক ব্যক্তি চিকিৎসা নেবার জন্যে ডাঃ সাহেবের বাড়ীতে যায়। ডাঃ সাহেব তাকে ভেতরে ডেকে নেন। সে পেট ব্যথা হচ্ছে বলে জানায়। ডাঃ সাহেব ঝুঁকে তার পেট দেখতে যান তখনই সে ছুরি দিয়ে ডাক্তার সাহেবের পেটে ও হাতে আঘাত করে। হত্যাকারী পেটে ২টি আঘাত করে পালিয়ে যায়; কিন্তু ডাক্তার সাহেবের চাকর দৌড়ে গিয়ে রাস্তায় আক্রমণকারীকে ধরে ফেলে এবং পুলিশে দেয়া হয়। ডাক্তার সাহেবকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু তিনি শীঘ্রই মারা যান (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শাহাদতের সময় ডাঃ সাহেবের বয়স ৬৫ বছর ছিল। খুনী আসামী পুলিশকে একাধিক মিথ্যা বক্তব্য পেশ করে। একবার বলে যে, ডাঃ সাহেব তাকে জাল মেডিকেল সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করে। আবার বলে ঔষুধের জন্যে টাকা চেয়েছিলাম ডাঃ সাহেব দেন নি তাই আক্রমণ করেছি।

এ্যডিশনাল সেশন জজ ফয়সালাবাদ মুহাম্মদ আসলাম জিয়া সাহেব খুনীকে যাবৎ জীবন কারাদন্ড দেন কিন্তু হাইকোর্ট থেকে আসামীকে খালাস দেয়া হয়।

শহীদ ডাঃ সাহেব বিধবা স্ত্রী তাহেরা কাদের সাহেবা এবং তিন কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রেয্ওয়ান কাদেরকে রেখে গেছেন। রেয্ওয়ান কাদের ডেট্রয়েট আমেরিকায় আছেন। বড় মেয়ে ডাঃ নায়েলা আহমদ ডাঃ সেলিম সাহেবের স্ত্রী। দ্বিতীয়া মেয়ে ডাঃ শায়লা সাহেবা জনাব জাফরুল্লাহ্ খাঁন নাইরোবীর স্ত্রী। তৃতীয়া মেয়ে ডাঃ ফায়েযা রহমান সাহেবা ডাঃ লুৎফুর রহমান সাহেবের স্ত্রী। ডাঃ শায়লা ছাড়া সবাই আমেরিকায় আছেন। প্রসংগক্রমে উল্লেখ করছি যে, মুকাররম আপা সায়েরা সাহেবা কর্ণেল মালেক সাদেক সাহেবের স্ত্রীর (রাওয়ালপিন্ডি) মৃত্যুর সময় বলেছিলেন যে, সায়েরা চীনী সাহেবের মেয়ে ছিলেন। প্রথম কথা এই যে, তিনি কারী গোলাম মুস্তাফা সাহেবের (যিনি চীনী বলে পরিচিত ছিলেন) কন্যা নয় বরং নাত্নী ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ কারী গোলাম মুস্তাফাও আসলে চীনী ছিলেন না সম্ভবতঃ তিনি তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হংকং এর একজন চীনী মহিলার সাথে করেন বলে তিনিও চীনী বলে পরিচিতি লাভ করেন। উপরে উল্লেখিত ডাঃ আব্দুল কাদের সাহেব চীনী শহীদ ঐ চীনী মহিলার সন্তান ছিলেন কিন্তু আপা সায়েরা চীনী মায়ের সন্তান ছিলেন না।

ডাঃ এনামুর রহমান শহীদ শুক্কুরে চাকুরী করতেন। ১৫ই মার্চ, ১৯৮৫ ইং শহীদ হন। তিনি মৌলভী আব্দুর রহমান আনোয়ারের পুত্র ছিলেন। ১৯৩৭ ইং কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ানে লাভ করেন। ম্যাট্রিক রাব্ওয়া থেকে পাশ করেন। লাহোরে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। পরে সিন্ধু প্রদেশে গিয়ে মেডিকেল প্রাকটিস আরম্ভ করেন।

অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, গরীবদের বন্ধু এবং জামাতের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি শুক্কুর, শিকারপুর এবং যেকোবাবাদ জেলাসমূহের মজলিস আন্সারুল্লাহ্‌র নাযেম জিলা ছিলেন। শাহাদতের সময় তিনি শুক্কুর শহরের নিকটে একগ্রামে সরকারী মেডিকেল সেন্টারে চাকুরীরত ছিলেন। শহীদ মরহুমের স্ত্রী বেগম আমাতুল হাফিয শওকত সাহেবা বর্ণনা করেছেন, একদিন অনেক বন্ধু-বান্ধব তাঁকে বল্লেন যে, বর্তমানে আহমদী বিরোধী আন্দোলন খুব বেশী অতএব, সাবধান। কিন্তু ডাঃ এনামুর রহমান কর্মস্থল ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে বলেন, "যদি আমি চলে যাই তবে এখানে কোন আহমদী থাকছে না। এলাকা আহমদীশূন্য হয়ে পড়বে।" তাঁর আত্মীয়-স্বজন ভাই-বোন সবাই তাঁকে ঐ এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলেন কিন্তু তিনি সম্মত হন নি। বলেছেন, "সম্ভবতঃ সিন্ধুর মাটি আমার রক্ত চায়।" বুকে হাত রেখে বলেন "আমি সে জন্যে প্রস্তুত আছি।"

১৫ই মার্চ, ১৯৮৫ ইং তারিখে শুক্কুর শহরে আহমদীয়া মসজিদে নামায জুমুআ আদায়ের পর তিনি স্ত্রী সহ মাংস ক্রয় করে পকেট থেকে টাকা বের করছিলেন। এমন সময় পিছন থেকে বন্দুক ও চাকুসহ আক্রমণকারীরা আক্রমণ করে। ফলে তিনি রক্তাক্ত হয়ে যান। শহীদ নিজ রক্ত আংগুলে ভিজিয়ে রক্ত দিয়ে লিখলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" এবং ঘটনা স্থলেই ছট্ ফট্ করতে করতে আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে যান (ইন্না লিল্লাহে -------- রাজিউন)।

শহীদ মরহুম প্রায় ৪৯ বছর বয়সে শাহাদত বরণ করেন। বিধবা স্ত্রী এবং এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রেখে যান। পুত্র মাহমুদুর রহমান আনোয়ার এখনও অবিবাহিত এবং সুইজারল্যান্ডে অবস্থান করছেন। কন্যা আমাতুন নাসীর সাহেবা স্বামী ফযলুর রহমান আনোয়ার সাহেবের সাথে হ্যামবুর্গ, জার্মানীতে অবস্থান করছেন।

শহীদ চৌধুরী আব্দুর রাজ্জাক সাহেব বিরিয়া রোড সিন্ধু প্রদেশে বসবাস করতেন। ৭ই এপ্রিল, ১৯৮৫ ইং শাহাদত বরণ করেন। ১৯২৯ ইং সনে ফয়সালাবাদের গোখেয়ালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আব্দুস সাত্তার সাহেব। ম্যাট্রিক পাশ করার পরে এক বন্ধুর কাছে একাউন্টেন্ট হিসেবে কর্মরত হন। তাঁর কর্তব্যবোধ ও যোগ্যতা ও সততার কারণে আকৃষ্ট হন ঐ ব্যক্তি। নিজ ব্যবসার মধ্যে আব্দুর রাজ্জাক সাহেবকে অংশীদার করে নেন। কিছুকাল পরে তিনি সিন্ধু প্রদেশে গিয়ে বিরিয়ারোডে কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন। আল্লাহ্‌তাআলা এত বরকত দান করেন যে, তিনি একটি তুলা ফ্যাক্টরী, সার বিক্রয়ের এজেন্সী এবং প্রায় দু'শ একর জমির মালিক হয়ে যান। তিনি একসময় বিরিয়া রোড গল্লা মন্ডির নির্বাচিত সভাপতিও ছিলেন।

মুকাররম চৌধুরী সাহেব বড়ই ধৈর্যশীল ও জাগতিক ভোগ-বিলাসের প্রতি অনাসক্তি সরল সহজ ব্যক্তি ছিলেন। তবলীগের বড় আগ্রহ রাখতেন। গরীব মিসকীনদের প্রতি সর্বদা সদয় দৃষ্টি রাখতেন। যুগ-খলীফার সকল আদেশের প্রতি আমল করতেন। প্রথম থেকেই বিরিয়া রোড জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। শাহাদতের একবছর পূর্বে আমীর জেলাও নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৮৪ ইং সনে অর্ডিনেন্স জারীর পর থেকে বেনামী পত্রের মাধ্যমে বরাবরই হুমকী দেয়া হচ্ছিল যে, 'মুসলমান হয়ে যাও নতুবা হত্যা করা হবে।' কিন্তু কখনও তিনি এসব হুমকীর কারণে ভীত হন নি। ৭ই এপ্রিল, ১৯৮৫ অন্যান্য দিনের মতই তিনি নিজ দোকানে বসেছিলেন। সকাল ১১টায় এক হতভাগ্য আততায়ী তাঁকে গুলি করে শহীদ করে। ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদত বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ------ রাজেউন)। হত্যাকারীকে তখনিই হাতে-নাতে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছিল। মীর মোহাম্মদ নামক হত্যাকারী 'শার গোত্রের' সদস্য ছিল। আসামী পুলিশের নিকট প্রাথমিক বর্ণনায় বলে যে, চৌধুরী আব্দুর রাজ্জাক কাদিয়ানী কাফের ছিল তাই তাকে খুন করে আমি বেহেশ্‌তে নিজের জন্যে স্থান সংরক্ষণ করছি। শহীদ মরহুম বৃদ্ধা মা এবং এক বিধবা স্ত্রী, দুই মেয়ে, পাঁচ ছেলে রেখে গেছেন। বড় ছেলে মুকাররম মাহমুদ আহমদ, কায়েদ জেলা নওয়াব শাহ ছিলেন। আজকাল যয়ীম আনসারুল্লাহ্ বিরিয়া রোড হিসেবে আছেন। পিতার ব্যবসা ও জমিদারী দেখা শোনা করেন। তিনি বিবাহিত। দ্বিতীয় ছেলে চৌধুরী নাসের আহমদ সাহেব পিতার শাহাদতের পূর্বেই নিজের কর্মজীবন পৃথক করে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৯৪ ইং তিনি মারা যান। তৃতীয় ছেলে চৌধুরী এজায আহমদ আনসারুল্লাহ্ রিজিওনাল যয়ীম হিসেবে কাজ করছেন। চতুর্থ ছেলে ডাঃ তাহের আহমদ সাহেব লিয়াকত মেডিকেল কলেজ থেকে এম, বি, বি, এস, পাশ করে আজকাল নওয়াব শাহ্ হাসপাতালে কর্মরত আছেন এবং নাযেম ইসলাহ্ ও ইরশাদ রিজিওনাল মজলিস হিসেবে কাজ করছেন। পঞ্চম ছেলে তারেক আহমদ, বি. এস. সি. পাশ করে স্থানীয় পর্যায়ে কনষ্ট্রাকশনের কাজ করছেন। কন্যাদের মধ্যে সাজেদা সাহেবার স্বামী আব্দুল ওয়াসে সাহেবের সাথে জার্মানীতে আছেন। অপর কন্যার বিবাহ মনোয়ার সাহেবের সাথে মেহরাবপুরে হয়েছে। মনোয়ার সাহেব মেহরাবপুরের শহীদ চৌধুরী আব্দুল হামীদের ছেলে। তাঁরা মেহরাবপুরেই আছেন।

শহীদ ডাঃ আকিল বিন আব্দুল কাদের সাহেব হায়দ্রাবাদে বাস করতেন। ৯ই জুন, ১৯৮৫ ইং শাহাদত বরণ করেন। ডাঃ আকিল সাহেব হযরত মৌলানা সৈয়্যদ আব্দুল মাজেদ সাহেব ভাগলপুরীর নাতী এবং প্রফেসর সৈয়্যদ আব্দুল কাদের (রাঃ)-এর সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। প্রফেসার সৈয়দ আব্দুল কাদের সাহেব ১৯০২ ইং সনে লিখিতভাবে এবং ১৯০৩ ইং স্বয়ং উপস্থিত হয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়াত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

মুকাররম ডাঃ আকিল বিন্ আব্দুল কাদের সাহেব ২১শে অক্টোবর, ১৯২১ ইং জন্মগ্রহণ করেন। কোলকাতা থেকে মেট্রিক এবং ১৯৪৬ ইং পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করেন। পরে পাকিস্তানে এসে পাকিস্তান আর্মীতে মেজর ডাক্তার হিসেবে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর পরামর্শে চোখের ডাক্তার হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন। চিকিৎসক হিসেবে তিনি অনেক বড় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দূর দূর থেকে তাঁর নিকট দুরারোগ্য রুগী এসে সুস্থ হয়ে যেত। বিশ বছর পর্যন্ত তিনি লিয়াকত মেডিকেল কলেজে প্রফেসর হিসেবে কর্তব্য পালন করেছেন। কিছুদিন ফযলে ওমর হাসপাতাল রাবওয়াতেও কাজ করেছিলেন। গরীবদের বিনা খরচে চিকিৎসা করতেন। কুরআন শরীফের সাথে গভীর আত্মিক সম্পর্ক ছিল। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর পুস্তকাদি মনোযোগ সহকারে পাঠ করতেন। বিরোধিতা সত্ত্বেও নির্ভিক চিত্তে তবলীগ করতেন। শাহাদত বরণকালে তিনি স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

৯ই জুন, ১৯৮৫ ইং তারিখে দিনের বেলায় মোটর কার চালিয়ে বাড়ী আসছিলেন। যখন তিনি বাড়ী এসে কার থামান সাথে সাথে নিকটে লুকিয়ে থাকা দু'জন আক্রমণকারী ডাক্তার সাহেবের ঘাড়ের উপর চাকু বা ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে। আঘাত করতে থাকে দ্রুত।ডাক্তার সাহেব কারের হর্ন বাজালে তারা পালিয়ে যায়। ডাক্তার সাহেব স্বয়ং কার চালিয়ে দ্রুত হাসপাতালে যান। কিন্তু রক্ত ক্ষরণ বেশী হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি শীঘ্রই ইন্‌তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে --------- রাজেউন)।

পুলিশে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু কোন আসামী গ্রেফতার হয় নি। শহীদ মরহুম বহু রুগীকে নিজ খরচে চিকিৎসা করাতেন। এমন কি অনেকের ছেলে-মেয়েদেরও পড়ার খরচ দিতেন। অত্যন্ত অমায়িক আমিত্ব বিবর্জিত নিষ্ঠাবান নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। হামেশা আপনজন ও অপরজনকে একতরফা সেবা করে গেছেন। কখনও কিছু বিনিময়, পাওয়ার কথা মনেও করতেন না। আজীবন কেবল মানব সেবাই করে গেছেন।

ডাঃ আকিল শহীদের শাহাদতের সময় আমি খুতবা জুমুআয় বলেছিলাম, "প্রতিনিয়ত যেভাবে আমাদের মহৎপ্রাণ ব্যক্তিরা এভাবে শহীদ হয়ে যাচ্ছেন-- এতে করে দেশ ও জাতির ভাল মানুষরা বিদায় নিচ্ছেন। অথচ এরাই দেশ ও জাতির রক্ষা কবযস্বরূপ। এঁরা এমন এমন মহান বুযর্গ ব্যক্তিত্ব যাদের উপর আল্লাহ্‌র কৃপা দৃষ্টি পড়ে থাকে। যার ফলে অন্যেরাও আল্লাহ্‌র ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি পেয়ে থাকে।" শহীদ মরহুম তাঁর স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ অত্যন্ত পুণ্যবতী আহমদী বিধবা স্ত্রী মোহতরমা নাসেরা বেগম সাহেবা ছাড়াও এক কন্যা ও দুই পুত্র সন্তান রেখে যান। ছেলে-মেয়েরাও পিতামাতার মতই অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী। কন্যা নুসরাত বিনতে আকিল সাহেবা তার স্বামী মেজর তারেক বিন ইব্রাহীমের সাথে করাচীতে আছেন। উভয় পুত্র মুসলিম বিন আকীল ও অওন বিন আকীল নরওয়েতে বসবাস করছেন। উভয়ে ডাক্তার হয়েছেন এবং ইহকাল ও পরকালের সকল নেয়ামত লাভ করছেন।

শহীদ মুনীর আহমদ সাহেব আঠওয়াল পুন্নু আকেল সিন্ধু প্রদেশে বাস করতেন। তাঁর সম্পর্কে পরবর্তীতে বলব, ইন্‌শাল্লাহ্। আজ সময় শেষ হয়ে গেছে।

অনুবাদ- মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
সদর মুরব্বী

(৪ পৃষ্ঠার বাকী অংশ)

গালি দেয়। অবশেষে ইহারাই ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। তাহাদের গালি-গালাজ এবং ষড়যন্ত্র নিশ্চয় আমাকে ক্লান্ত করিতে পারিবে না। যদি আমি খোদাতাআলার পক্ষ হইতে না হইতাম তবে নিঃসন্দেহে আমি তাহাদের গালি-গালাজে ভয় পাইয়া যাইতাম। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি খোদা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছেন। অতএব আমি এই সকল তুচ্ছ কথার কী পরোয়া করিব" (মলফুযাত, খন্ড ৭, পৃঃ ২০৪)।

"আমি তোমাদিগকে এই কথাও বলিয়া দিতেছি যে, আল্লাহ্‌তাআলা এই ব্যাপারে এতখানি সমর্থন করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এই জামাতের হইয়াও ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত আচরণ না করে তবে সে স্মরণ রাখুক, সে এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত নহে। রাগ ও উত্তেজনার বড় কারণ এই হইতে পারে যে, আমাকে অশ্লীল গালি-গালাজ করা হইয়া থাকে। সেক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি খোদার উপর সোপর্দ করিয়া দাও। তোমরা ইহার ফয়সালা করিতে পারিবে না। আমার ব্যাপারটি খোদার উপর ছাড়িয়া দাও। তোমরা এই সকল গালি-গালাজ শুনিয়াও ধৈর্য-সহিষ্ণুতার সহিত আচরণ কর। তোমরা জান না আমি এই সকল লোকের নিকট হইতে কতখানি গালি-গালাজ শুনি। প্রায়ই এইরূপ হয় যে, আমার নিকট অশ্লীল গালি-গালাজপূর্ণ চিঠি আসে এবং খোলা কার্ডে গালি-গালাজ করা হইয়া থাকে। বেয়ারিং চিঠিতে আসে যাহার মাশুলও দিতে হয়। অতঃপর যখন আমি পড়ি তখন দেখি যে, এইগুলি গালি-গালাজের স্তুপ" (মলফুযাত, খন্ড ৭, পৃঃ ২০৪)।

(খোদা উপর) ভরসা

"যে সকল লোক তাহাদের বাহুবলের উপর ভরসা করে এবং খোদাতাআলাকে পরিত্যাগ করে তাহাদের পরিণাম ভাল হয় না। খোদাতাআলার উপর ভরসা করার অর্থ এই নহে যে, হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাক। বরং (ইহার অর্থ এই যে,) খোদাতাআলার সৃষ্ট উপকরণ কাজে লাগাও এবং তাঁহার দেওয়া শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ কর। অতঃপর ফলাফলের জন্য খোদাতাআলার উপর ভরসা করাই প্রকৃত পথ এবং ইহাই খোদাতাআলার জন্য কদর" (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৪৪ নূতন এডিশন)।

"এই কথাও স্মরণ রাখ, বিপদের যখমের জন্য আল্লাহ্‌তাআলার উপর ভরসা করার ন্যায় বেশী শক্তিদায়ক ও আরামপ্রদ কোন মলম নাই। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার উপর ভরসা করে সে কঠিন হইতে কঠিনতর মুশ্‌কিল ও বিপদেও মনের গহীনে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে। সে তাহার হৃদয়ে তিক্ততা ও আযাব অনুভব করে না। বড়জোর এই বিপদের পরিণতি এই হইতে পারে যে, যদি তকদীর অলংঘণীয় হয় তবে মৃত্যু আসিবে। কিন্তু ইহাতে কী হইল ? পৃথিবী কোন এমন স্থানই নহে যেখানে কেহ চিরকাল থাকিতে পারিবে। অবশেষে একদিন ও একটি সময় সকলের নিকটেই আসে যখন এই পৃথিবী ছাড়িতে হয়। তাহা হইলে যদি তাহার মৃত্যু আসিয়া যায় তবে আপত্তির কি আছে। মু'মিনের জন্য তো এই মৃত্যু আরো আনন্দদায়ক ও বন্ধুর সহিত মিলনের মাধ্যম হইয়া যায়। ইহা এই জন্য যে, সে আল্লাহ্‌তাআলার উপর পরিপূর্ণ ঈমান এবং তাঁর কুদরতের উপর ভরসা করে এবং সে জানে পরকাল তাহার জন্য চিরস্থায়ী শান্তির জায়গা" (মলফুযাত, খন্ড ৮, পৃঃ ৪৫)।

"প্রকৃত রিয্‌কের মালিক খোদাতাআলা। ঐ ব্যক্তি যে তাঁহার উপর ভরসা করে সে কখনো রিয্‌ক হইতে বঞ্চিত থাকিতে পারে না। তিনি সর্বপ্রকারে ও সব জায়গা হইতে তাঁহার উপর ভরসাকারী ব্যক্তির জন্য রিয্‌ক পৌঁছাইয়া থাকেন। খোদাতাআলা বলেন, যে আমার উপর ভরসা করে ও নির্ভর করে আমি তাহার জন্য আকাশ হইতে ও ভূতল হইতে বর্ষণ করি। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির খোদাতাআলার উপর ভরসা করা উচত (মলফুযাত, খন্ড ৯, পৃঃ ৩৬০)।"

অনুবাদ ঃ নাজির আহমদ ভূঁইয়া

মরহুম শামসুর রহমান স্মরণে

বিগত ২৪শে জুলাই বাংলাদেশ জামাতের নায়েবে আমীর (২) দেহ ত্যাগ করে তাঁর মৌলার দরবারে চলে গেছেন (ইন্নালিল্লাহে . . . .)। তিনি জামাতের একজন নীরব কর্মী ছিলেন। চলেও গেলেন নীরবে। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বহু দিনের। তাঁর পিতা মরহুম কফিলউদ্দীন সাহেব ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট। আমি ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সালে প্রায় দেড় বৎসর প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার মরহুম কফিলউদ্দীন সাহেবের বাড়ীতে অবস্থান করি। কারণ আমি ছিলাম ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মোকদ্দমার মুখ্য আসামী। ১৯৬৩ সালের ৩রা নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ৪৭তম জলসায় আমি ছিলাম বক্তা। আমি পুনের মিনিট বক্তৃতা দেবার পর বিরুদ্ধবাদীরা সভায় হামলা করে। আমি সূরা তকভীর পাঠ করে সাদাকাতে মসীহে মাওউদের উপর বক্তৃতা শুরু করি। কুরআন, হাদীস, বাইবেল ও হিন্দুগ্রন্থে বর্ণিত চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের বর্ণনা দিচ্ছি, ঠিক ঐ সয় একটি ইট মারা হয় আমার উপরে। আমি হাতের নোট বই দিয়ে সেই আঘাত প্রতিহত করি। এরপর শুরু হয় বৃষ্টির মত ইট বর্ষণ। কফিলউদ্দীন সাহেবের বড় পুত্র ইদ্রিস সাহেবও ছিলেন ঐ সভায়। তিনি এ ব্যাপারে একটি রুইয়াও দেখেছিলেন একদিন পূর্বে। শামসুর রহমান সাহেব তখন ঢাকায় থাকতেন। আমি আসামী হিসেবে এবং ব্যারিষ্টার শামসুর রহমান সাহেব, জাহিদুর রহমান মুক্তার সাহেব এবং উকিল সতীশ বাবু থাকতাম কফিলউদ্দীন সাহেবের ছোট টিনের বৈঠক খানা ঘরে। তিতাস নদীতে গোসল করতাম। কফিলউদ্দীন সাহেবের ছোট দুই ছেলে আমাদেরকে খাবার পরিবেশন করত।

কফিলউদ্দীন সাহেব একজন ফিদায়ী আহমদী ছিলেন। ভৈরব, মাধবপুর ইত্যাদি স্থানে গিয়ে ব্যবসা করতেন। ফিরে এসেই জামাতের কাজে আত্ম-নিয়োগ করতেন। অত্যন্ত সহজ জীবন ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন একজন সার্থক প্রেসিডেন্ট। এই সুবাদেই অর্থাৎ কফিলউদ্দীন সাহেবের পুত্র হিসাবে মরহুম শামসুর রহমান সাহেবের সঙ্গে ঢাকায় আমার হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কারণ তাঁর বাড়ীতে আমি নিমক খেয়েছি প্রায় দেড় বৎসরের প্রতিটি মাসে। তাঁর পিতার ভালবাসা পেয়েছি আসামী থাকাকালে। তিনি দোয়া করতেন যেন আমরা খালাস পাই। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল আমি নাকি আপত্তিকর বক্তৃতা দিয়েছি তাই জনতা হামলা করেছে। অথচ আমার বক্তৃতা ছিল সাদাকাতে মসীহ মাওউদ (আঃ)।

শামসুর রহমান সাহেব যখন জামাতের সেক্রেটারী ছিলেন আমি তখন নায়েবে আমীর এবং পরে আমীর। তিনি অত্যন্ত নীরব কর্মী ছিলেন, নেযামের অনুগত ছিলেন। যে দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হ'ত তিনি তা হাসি মুখে পালন করতেন। জামাতের কাজ, আনসারুল্লাহ্‌র কাজ তিনি করে দিতেন। তিনি যখন নায়েবে আমীর হলেন তখন তিনি আরো নীরব হয়ে গেলেন। যখন তিনি ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করতেন তখন আমি আঞ্জুমানে গেলে আমাকে ডেকে তাঁর পাশে বসাতেন। তাঁর ভদ্রতা জ্ঞান ছিল খুব বেশী। নায়েবে আমীর হওয়ার পর আমি তাঁকে বলতাম, আপনার এই পদমর্যাদা আপনার পুণ্যবান পিতার দোয়ার ফল।

হঠাৎ শুনি তাঁর অপারেশন হবে। অথচ তিনি যে ভয়ানক অসুস্থ তা টেরও পাই নি। অপারেশনের পর জানলাম তাঁর ক্যান্সার হয়েছে। ধীরে ধীরে তিনি তলিয়ে গেছেন মৃত্যুর অতল গহ্বরে। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করুন। তাঁর ভাই বেরাদর এবং পুত্রকে তাঁর আদর্শ অনুসরণের তৌফীক দান করুন, আমীন।

তাঁর সহধর্মিণী মাকসুদা রহমান সাহেবা বাংলাদেশ লাজনার বর্তমান সদর। তাঁর কাছে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

– আহমদ তৌফিক চৌধুরী

নও মুবাঈন (নব-দীক্ষিতগণ) ও আমাদের দায়িত্বাবলী

সৈয়্যদ রসূল নিয়াজ, মুবাল্লেগ

প্রবল প্রতাপের অধিকারী মহান খোদা প্রত্যেক যুগে সৃষ্টির সংশোধনের জন্যে তাঁর মনোনীত দাসগণকে অবতীর্ণ করে থাকেন। আর সব শেষে এ বিশ্ব-জগতের মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য খাতামুল আম্বিয়া খাতামুল মুরসালীন সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন। শয়তানের চেলা-চামুন্ডারা তাঁকে বিফল মনোরথ করার জন্যে কোন চেষ্টার ত্রুটি করে নি। কিন্তু খোদাতাআলা তাঁকে (সঃ) সফলতার মুকুট পরিধান করিয়েছেন। আর সারা বিশ্বে তাঁকে সার্বিক বিজয় দানের লক্ষ্যে ও খোদার একত্ববাদের ন্যায় পৃথিবীতেও একক জামাত প্রতিষ্ঠা কল্পে আল্লাহ্‌তাআলা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর মহান দাস সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে আবির্ভূত করেছেন। তিনি ঐশী শুভসংবাদসমূহ অনুযায়ী তাঁর (আঃ) আগমনের উদ্দেশ্য এভাবে ঘোষণা করেছেন ঃ

"এ যুগে খোদাতাআলার পক্ষ থেকে আমার আগমনের উদ্দেশ্য কেবল মুসলমানদের সংশোধনই নয় বরং মুসলমান, হিন্দু ও খৃষ্টান এ তিন জাতিরই সংশোধন। আর যেভাবে আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে মুসলমান ও খৃষ্টানদের জন্যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ করে পাঠিয়েছেন তেমনিভাবে আমি হিন্দুদের জন্যেও অবতার হয়ে এসেছি। আর আমি (বিশ বছর ধরে বা কিছু বেশী সময় ধরে) একথা লোক সমাজে জানিয়ে আসছি যে, বিশ্বে যেসব পাপ সাধিত হচ্ছে সেগুলো দূরীভূত করণার্থে আমি আবির্ভূত হয়েছি। যেভাবে আমি মসীহ্ ইবনে মরিয়মের রঙ্গে রঙ্গীণ সেভাবে রাজা শ্রী কৃষ্ণের রঙ্গেও রঙ্গীণ। তিনি ছিলেন হিন্দু ধর্মের সকল অবতারদের মধ্যে একজন বড় অবতার অথবা এভাবে বলা উচিত যে, আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে তিনি আর আমি একই। ইহা আমার ধারণা বা অনুমান-ভিত্তিক নয়। বরং ঐ খোদা যিনি পৃথিবী ও আকাশের খোদা, তিনিই আমার নিকটে ইহা প্রকাশ করেছেন। কেবল একবারই নয় বরং কয়েকবার আমাকে ইহা বলেছেন- তুমি হিন্দুদের জন্যে কৃষ্ণ এবং মুসলমান ও খৃষ্টানদের জন্যে প্রতিশ্রুত মসীহ্" (লেকচার সিয়ালকোট, পৃষ্ঠা ২৩)।

সুতরাং খোদাতাআলা তাঁকে মহান সফলতার সুসংবাদ দ্বারা ভূষিত করেছেন। আর আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের আলোকে ভবিষ্যতের প্রসঙ্গে তাঁকে এভাবে সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং হুযূর (আঃ) বলেন ঃ

"এখন ঐ দিন নিকটবর্তী যখন সত্যিকার সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং ইউরোপ সত্য খোদার সন্ধান লাভ করবে। সময় নিকটবর্তী যে, সকল জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে কেবল ইসলাম ব্যতিরেকে এবং সকল অস্ত্র খান্ খান্ হয়ে যাবে ; কিন্তু ইসলামের ঐশী অস্ত্র না ভেঙ্গে যাবে আর না ভোঁতা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত দজ্জালিয়্যতকে টুকরো টুকরো করে না দেবে-------- আর খোদার একটাই হাত কুফরীর সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে রহিত করে দেবে" (তাযকিরা, পৃষ্ঠা ২৯৪)।

তিনি আরও বলেন ঃ

"ইসলামের সাম্রাজ্যের এসব আক্রমণের ব্যাপারে কোন উৎকণ্ঠা নেই। এর গৌরবের দিন সমাগত। আর আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আকাশে উহার বিজয়ের নিদর্শন প্রকাশিত হয়ে গেছে" (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম)।

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একক ব্যক্তি, ইসলামের বিজয়ের জন্যে দন্ডায়মান হয়ে গেছেন। তাঁকে বিনাশ করার জন্যে যুগের ফেরাউনী শক্তি তাদের সর্বপ্রকার অস্ত্র ব্যবহার করেছে। খুবই চেষ্টা করেছে যে, কীভাবে এ ব্যক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যায়। হত্যা করার চক্রান্ত করেছে। জেলখানায় আবদ্ধ করার ঘৃণিত আকাঙ্ক্ষা করেছে। দুর্নাম করার পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। কিন্তু খোদাতাআলা সব প্রতিকূলতা দূরীভূত করেছেন। আর এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন আর এভাবে শত শত পরে হাজার হাজার ও লক্ষে লক্ষে লোক এ ঐশী জামাতের নিবেদিত প্রাণে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তিনি স্বীয় পথে অগ্রসরমান হয়েছেন। জামাতের মহান অগ্রযাত্রার উল্লেখ করে তিনি (আঃ) বলেন ঃ

"এমন এক সময় ছিলো যখন আমি একাকী পদচারণা করতাম আর এখন ঐ সময় যে, দুই লক্ষ থেকে অধিক লোক আমার সাথী হয়েছেন। আজ থেকে ২০-২২ বছর পূর্বে আল্লাহ্ বলেছিলেন যা কিনা 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকে লিখিত আছে যে, আমি তোমাকে সফলতা দান করবো এবং লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে তোমার সঙ্গী করে দেবো। এ পুস্তকখানা নিয়ে পড়ে দেখো এবং চিন্তা করে দেখো যে, ইহা কি মানুষের কাজ যে, এত দিন আগের সংবাদ লিপিবদ্ধ করে এবং এত বিরোধিতা সত্ত্বেও ঐ কথা পূর্ণ হয়ে যায় ? সুতরাং যে ব্যক্তি খোদার এ কর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে সেই হতভাগ্য বিনাশপ্রাপ্ত হবে" (আল্ বদর, ২য় খন্ড, নম্বর ৪৮, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ)।

এর পরে ১৯০৫ সনের ৪ঠা নভেম্বর লেকচার লুধিয়ানাতে হুযূর (আঃ) বলেন,

"আজ আমি খোদাতাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, একটা যুগ ছিলো যখন আমি এ শহরে আসি এবং এখান থেকে চলে যাই তখন কেবল কতিপয় ব্যক্তি আমার সঙ্গী ছিলো এবং আমার জামাতের সংখ্যা ছিলো খুবই নগণ্য। আর এখন ঐ সময় এসে গেছে যে, তোমরা দেখে থাকো, এক বিরাট জামাত আমার সাথে আছে। আর জামাতের সদস্য সংখ্যা তিন লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং দিনে দিনে উন্নতি হচ্ছে এবং অবশ্যই ইহা কোটিতে পৌঁছুবে" (মলফুযাত, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৫)।

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পরে প্রথম খেলাফতের সময়েও আহমদীয়তের বিরোধীরা আবার নতুন করে মাথা ঠোকাতে থাকে। কিন্তু বিফলতা তাদের ভাগ্যে ছিলো। তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার একশেষ হলো এবং ইসলামের প্রচারের কাজে প্রবৃদ্ধি ঘটলো। বিদেশে প্রথম মিশন স্থাপিত হলো লন্ডনে। ইহা প্রথম খেলাফতের মহাকল্যাণ। এর পরে দ্বিতীয় খেলাফতের কল্যাণময় যুগে এমন মহান উন্নতি সাধিত হয় যে, বিশ্ব জেনে গেলো, এখন ইহাকে বাধা দেয়ার আর কেউ নেই। প্রত্যেক জাতি বিস্মিত হতে লাগলো যে, এখন এ জামাত ঝড়ের গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জামাত কেবল অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয় বরং ব্যবস্থাপনায়ও সুদৃঢ় হয় আর এক ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিতে পরিবর্তিত হয় এবং বিশ্বের ৫৬ টি দেশে কাদিয়ান থেকে উত্থিত আওয়াজ গুঞ্জরিত হতে থাকে। সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এখন অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হচ্ছে।

হুযূর (রাঃ) বলেছিলেন ঃ

"আমাদের উন্নতির যুগও খোদার আসিশক্রমে সমাগত। আর ঐ দিন দূরে নয়, দলে দলে লোক এ জামাতে প্রবেশ করবে। বিভিন্ন দেশে জামাতের পর জামাত প্রবেশ করবে। ঐ যুগ এসে গেছে যে, গ্রামের পর গ্রাম ও শহরের পর শহর আহমদী হবে" (ঐতিহাসিক সতর্কবাণী, ২৮ শে ডিসেম্বর, ১৯১৫, লন্ডন)।

আবার সৈয়্যদনা হযরত মির্যা নাসের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)-এর গৌরবোজ্জ্বল খেলাফতকালে ৫৬ টি দেশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৭ টি দেশে খুবই দৃঢ়তার সাথে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

পুনরায় সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) সারা জামাতকে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সব সময়ের চিন্তা দাওয়াত ইলাল্লায় পরিণত হয়েছে। তাঁর ধারাবাহিক নির্দেশাদি ও দোয়ার ফলে জামাত দৃষ্টান্তবিহীন উন্নতিসমূহ স্পর্শ করছে। আর ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু ওয়া রায়াইতান্নাসা ইয়াদখুলূনা ফী দীনিল্লাহি আফওয়াজা (অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে)-এর দৃশ্য দিবালোকের ন্যায় দৃশ্যমান হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় লোক আহমদীয়তে প্রবেশ করছে। অধিক সুন্দর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজ করার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুযূর (আইঃ) বলেনঃ

"অতএব আজ সময় এসে গিয়েছে যেন গোটা জামাত পূর্ণ শক্তি সহকারে নিজেদের নিষ্কর্মা সদস্যগণকে বা জমাতের ঐসব ব্যক্তিদের যারা এখনও কাজ আরম্ভ করতে পারে নি তাদের সাথে নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়। খোদাতাআলা এ পর্যন্ত আমাদের সাথে যে কল্যাণমন্ডিত আচরণ করেছেন যে, প্রত্যেক বছর আমরা দ্বিগুণ হচ্ছি। এখন মঞ্জিল বা স্তর এমন এসেছে যে, এই বিশ্বাসই হয় না, এখন কীভাবে দ্বিগুণ হবে। অতএব বিনাভীতিতে এই সিদ্ধান্ত করো যে, অবশ্যই নিজেদের এক বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হতে হবে আর খোদার অনুগ্রহক্রমে যদি এ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত বিশ্বাস ও সত্যতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আপনাদের কর্ম আপনাদের এ সাহসিকতার সাথে সমর্থন যোগায় তাহলে আমি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি, আপনারা অবশ্যই দ্বিগুণ হবেন। বিশ্বের কোন শক্তি আপনাদের দ্বিগুণ হওয়াকে রোধ করতে পারে না" (জুমুআর খুতবা, ১৬ই আগষ্ট, ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ)।

যখন আমাদের প্রিয় নেতা সারা বিশ্বের জমাতকে টারগেট-এর আকারে দায়িত্ব দিচ্ছেন, প্রতি বছর আহমদীয়তে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে শত শত থেকে হাজারে হাজারে, হাজার হাজার থেকে লাখে লাখে এ সংখ্যা পরিবর্তিত হচ্ছে এখন ইনশাআল্লাহ্ ইহা কোটিতে পরিবর্তিত হবে, তখন ধারণা সৃষ্টি হয় যে,এসব লোকদের আমরা কীভাবে স্বাগতম জানাবো। আর তাদের তরবীয়তই বা কীভাবে করতে হবে ! এখন আমি আপনাদের সম্মুখে নও মুবাঈন (নব-দীক্ষিত)গণের তরবীয়তের ব্যাপারে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে আলোকপাত করবো ঃ

প্রথমতঃ *আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি 'আনিল মুনকার* (সঙ্গত কাজের আদেশ দান ও অসঙ্গত কাজ থেকে বিরত রাখা)। লোকদের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বার বার পুণ্য কাজের উৎসাহ দেবার জন্যে আমাদের লক্ষ লক্ষ মুবাল্লেগ ও মুয়াল্লেমের বিশেষ প্রয়োজন। তারা অসৎ কর্মের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করাবে এবং এভাবে লোকদের বা-খুদা (খোদা প্রিয় মানুষ) সৃষ্টি করতে তাদের জ্ঞান-ভিত্তিক ও কর্ম-ভিত্তিক সাহায্যে প্রদান করবে। যে মহান পুণ্য ও পবিত্র জামাত বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ওপরে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যেন ঐ জামাত সৃষ্টি হয়ে যায় এবং নতুন আগমনকারীদের উচ্চ মার্গে পরিবর্তন করে দেয়া হয়। প্রত্যেক জাতির সংশোধন ও উন্নতির জন্যে একটি দলের নির্দেশ দিতে থাকা দরকার। সুতরাং খোদাতাআলা এ বিষয়ের নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন--

ওয়াল তাকুম মিনকুম উম্মাতুন ইয়াদউনা ইলাল খায়েরে ওয়া ইয়া'মুরূনা বিল মা'রূফি ওয়া ইয়ানহাওনা আনিল মুনকারি ওয়া উলায়েকা হুমুল মুফলিহূন অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমনসব লোক থাকা উচিত যারা পুণ্যের আহ্বান করে এবং সঙ্গত কাজ ও অসঙ্গত কাজে নিজেদের কর্মময় জীবনকে উপস্থাপন করে। আর এসব লোকই সফলকামী।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) যা বলেছেন তা কতইনা খোদা প্রদত্ত ইঙ্গিতসমূহের ওপরে প্রতিষ্ঠিত বলে প্রতীয়মান এবং বর্তমান কালের চাহিদাসমূহ অনুযায়ী আজ আমাদের সবার জন্যে আবশ্যকীয় যেন আমরা সকলে তবলীগের মধ্যে ক্ষিপ্রগতিতে অবতরণ করি ঃ

"আমি জামাতের বন্ধুগণকে বারে বারে এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আমাদের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে এই যে, আমরা যেন সারা বিশ্বে ইসলাম ও আহমদীয়তের বাণী পৌছানোর জন্যে মুবাল্লেগণের (প্রচারকদের) জাল বিস্তার করি------- এর তাৎপর্য এই যে, সারা বিশ্বে সঠিক পন্থায় ইসলামের তবলীগ করার জন্যে আমাদের লক্ষ লক্ষ মুবাল্লেগ এবং কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন। যখন আমি রাত্রে বিছানায় শুয়ে থাকি তখন কখনও কখনও সারা বিশ্বে তবলীগকে বিস্তার দানের লক্ষ্যে বিভিন্ন রঙ্গে হিসেব কষি। কখনও মনে করি, আমাদের এত মুবাল্লিগের কমে কাজ চলতেই পারে না, এথেকেও অধিক মুবাল্লেগের প্রয়োজন। এমন কি যে, কখনও কখনও বিশ লক্ষ পর্যন্ত মুবাল্লেগের সংখ্যা পর্যন্ত পৌঁছে ঘুমিয়ে যাই। আমার ঐ সময়ের ধারণাসমূহ যদি লিপিবদ্ধ করা হয় তাহলে সম্ভবতঃ বিশ্ব মনে করবে যে, সবচে' বড় শেখ চিল্লী আমিই (শেখ চিল্লী এমন এক কল্পিত বোকা যে কেবল অদ্ভুত কল্পনার জাল বুনে- অনুবাদক)। কিন্তু ইহা আমার নিকট এতই মজাদার যে, সারা দিনের কান্তি দূর করে দেয়। ---- দুনিয়ার দৃষ্টিতে আমার এসব ধারণা একটি কল্পনার চেয়ে আর কোন মর্যাদা রাখে না। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলার এই-ই নিয়ম যে, যে-বস্তু একবার জন্ম নেয় উহা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করে। লোক আমাকে নিঃসন্দেহে শেখ চিল্লী বলুক, কিন্তু আমি জানি যে, আমার এই ধারণাগুলো খোদা কর্তৃক সৃষ্ট খাতায় রেকর্ড হয়ে চলেছে। আর ঐ দিন দূরে নয় যখন আমার এ ধারণাসমূহকে আল্লাহ্‌তাআলা বাস্তবে পূর্ণ করতে আরম্ভ করবেন। আজ নয় তো কাল বা শত বর্ষ পরে যদি খোদাতাআলার কোন বান্দা এমন হয়, যে আমার এ রেকর্ডগুলো পাঠ করবে এবং তার সৌভাগ্য হলে পরে সে এক লক্ষ মুবাল্লেগ তৈরী করে দিবে ------ এভাবে ধাপে ধাপে সারা বিশ্বে আমাদের বিশ লক্ষ মুবাল্লেগ কাজ করতে থাকবে। আল্লাহ্‌তাআলার সন্নিধানে প্রত্যেক ব্যাপারে একটি সময় নির্ধারিত থাকে। এর পূর্বে কারও আকাঙ্ক্ষা করা বোকামী। আমার এসব ধারণাও এখন রেকর্ডকৃত হয়ে গেছে। আর যুগের খাতা থেকে মিটে যেতে পারে না। আজ নয় তো কাল কাল নয়তো পরশু আমার এ ধারণাসমূহ বাস্তবাকৃতি ধারণ করবে " [সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর বক্তব্য, পাক্ষিক আখবারে আহমদীয়া লন্ডন, ডিসেম্বর ১৯৬৬ সনের বরাতে]।

বলা বাহুল্য বর্তমানে নবদীক্ষিত আহমদীদের তরবীয়তের জন্যে আহমদীদের নিজেদের ওয়াকফ করা ও ওয়াকফে আরযীর প্রোগ্রামকে পরিপূর্ণভাবে সফলতা দান করা খুবই প্রয়োজন। প্রত্যেকেই যেন এ পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করে। এতদ্ব্যতিরেকে নতুন লোকদেরকে তরবীয়ত প্রদান করা সম্ভব নয়। সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ওয়াকেফীনে আরযী ও স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে ১৯২২-২৩ সনে শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে সুসংগঠিত পরিকল্পনা প্রবর্তন করেছিলেন

তা খুবই সুফল বয়ে এনেছিলো। আর তাহরীকে জাদীদেরও একটি দাবী ছিলো যে, বেকার যুবকগণ বিদেশে আহমদীয়তের সেবা করুক। এভাবেও মহান সফলতা সাধিত হতে পারে। আর ওয়াকফে জাদীদের মাধ্যমেও মুয়াল্লেমদের কাজ আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু মুয়াল্লেমগণ তুলনায় খুবই অপ্রতুল। এজন্যে জামাতের লোকদের কর্তব্য তারা যেন সময় বের করে ওয়াকফে আরযী করেন।

১৯ শে মার্চ ১৯৬৬ তারিখে সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) জুমুআর খুতবায় ওয়াকফে আরযীর ঘোষণা করেন ঃ

" আমি জামাতের নিকট এ তাহরীক করছি যে, ঐ সকল বন্ধু যাদেরকে আল্লাহ্‌তাআলা সুযোগ দেন তারা বছরে এক সপ্তাহ থেকে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত সময় যেন ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করেন" (আল্ ফযল, ২৩ শে মার্চ, ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ)।

দ্বিতীয়তঃ তরবীয়তি (প্রশিক্ষণ) কেন্দ্র

স্থানে স্থানে তরবীয়তের জন্যে এমন কেন্দ্রসমূহ খোলা হয় যেখানে সাধারণভাবে ও সোৎসাহে শিখবার জন্যে একটি দল থাকে। আর নবদীক্ষিতগণের মধ্য থেকে যাদের সময় হয় তারা ঐ কেন্দ্রে এসে শিক্ষা লাভ করে। আবার ফিরে গিয়ে নিজেদের লোকদের তরবীয়ত করে। এখানে একটি পুণ্য ও পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হয় যদ্বারা আগমনকারীদের ওপরে সুপ্রভাব পতিত হয়। কিন্তু এজন্যে লোকেরা যেন সময় দেয় এবং আগমনকারীদের তরবীয়ত করে। সম্মানিত পাঠকদের হুযূর (আইঃ)-এর ভাষায় বলতে চাই ঃ

"এসব নতুন আগমনকারীদের এমন কেন্দ্রসমূহে ডাকো যেখানে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয় এবং ধর্মীয় জ্ঞানে বুৎপত্তি লাভ হয়। আর তাদেরকে ধর্ম-সম্বন্ধে এতটা অবহিত করো যে, তাদের মধ্যে ধর্মের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়ে যায়। তারা কেবল ছাত্র হিসেবেই যেন বসে না থাকে বরং শিক্ষকে পরিণত হয়ে সত্বর ফিরে গিয়ে নিজের জাতিকে সতর্ক করে। সুতরাং তরবীয়তের এমন ব্যবস্থা করো যে, কেবল তাদের নামায পড়াই শিক্ষা দিবে না দৈনন্দীন মসলা মাসায়েলই শিক্ষা দিবে না বরং ধর্মের বুৎপত্তি লাভ হয় এমন শিক্ষা দিবে। যদি ধর্মে-কর্মে বুৎপত্তি লাভ হয় তাহলে মানুষের মধ্যে এক অসীম আবেগ সৃষ্টি হয়ে যায়। তাদের হৃদয়ে অদম্য আকাঙ্ক্ষাসমূহের সৃষ্টি হয় যে, এমন প্রিয় ধর্মের কথা কেনই বা শিখবো না' (জুমুআর খুতবা, ১৯ শে আগষ্ট, ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ)।

এসব তরবীয়তি কেন্দ্রসমূহে বন্ধুগণ টিমের (দলে দলে) আকারে এসে ধর্মীয় শিক্ষা দিতে পারে। এজন্যেও লোকদের কুরবানী পেশ করা আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ নতুন লোকদের ওপরে দায়িত্ব অর্পণ করা

এ প্রসঙ্গে সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন ঃ

"এখন তো তাদের হায় আফসোস করার দিন এসে যাচ্ছে। ইহা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এখন তো আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার দিন এগিয়ে আসছে এবং আশা পূরণের রাতগুলো এগিয়ে আসছে----- আমি ঐ দিন দেখছি যখন এ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক এক বছর কোটি কোটি লোক আহমদী হবে। এখন চিন্তা তো শামলানোর চিন্তা। আমায় তো কেবল এই একটা চিন্তায়ই পেয়ে বসেছে যে, এসব আগমনকারী মেহমানগণকে কীভাবে শামালাই, কীভাবে তাদের সম্মান প্রদর্শন এবং তাদেরকে তাদের দায়িত্বাবলী বুঝাই যেন তারা আমাদের সাথে গুরুভার(Dead weight)-এর মত না চলে বরং বোঝা বহনকারী সাথীতে পরিণত হয়। কেননা, আগামীতে যে দ্রুত গতিতে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ঐ গতির সাথে আমাদের বহু কর্মীর প্রয়োজন যারা তাদের শামলিয়ে নেয়। তাদের সাথে নিয়ে চলে। আর নতুন আগমনকারীদের মধ্য থেকে অবশ্যই তাদের সৃষ্টি করতে হবে। এ কারণে আমি অনেক আগে থেকেই গুরুত্বারোপ করে আসছি যে, যদি আপনারা নতুন আগমনকারীদের তরবীয়ত করতে চান তাহলে তাদের ওপরে কাজের বোঝা অর্পণ করুন" (জুমুআর খুতবা, ২২ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ ও বদর পত্রিকা ১লা ফেব্রুয়ারী,১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ)।

কাউকে দুর্বল বা অযোগ্য মনে করা উচিত নয়। বরং কাজকে বন্টন করে দেয়া উচিত। সুতরাং হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ

"যখন আপনারা কারও ওপরে দায়িত্ব ন্যস্ত করেন তখন ইহা দেখবেন না যে, সে তো সাধারণ ও নগণ্য তার ওপরে কেন এ কাজ ন্যস্ত করি। প্রকৃতপক্ষে যখন আপনি নগণ্য মনে করে কারও ওপরে দায়িত্ব ন্যস্ত না করেন তখন আপনার মধ্যে একটি আত্মম্ভরিতার উপকরণ রয়েছে আর আত্মম্ভরিতার ফলে অবশ্যই ক্ষতি সাধিত হবে" (প্রাগুক্ত)।

"আল্লাহ্‌তাআলা তো স্বয়ং কাজ করে দিয়ে থাকেন। কিন্তু যদি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁর কাজের জন্যে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন এবং তাঁর কার্যাবলীর ওপরে দৃষ্টি রাখেন ..... অতএব যতগুলো জাতি আমাদের মধ্যে নতুন আস্‌ছে এ দেশের হোক বা জার্মানীর হোক অথবা আফ্রিকার হোক বা দূর প্রাচ্যের প্রশান্ত মহাসাগরীর দীপপুঞ্জেরই হোক সবার জন্যে একই ব্যবস্থাপত্র। ইহা কার্যকরী ব্যবস্থাপত্র। আপনাদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্যে নিজেদের বোঝা বৃদ্ধি করতে হবে আর যার ওপরে দায়িত্ব নেই তাকে দায়িত্ব দিতে হবে।..... সুতরাং আশ্চর্য কথা এই যে, আদম মাটি থেকে তৈরী হয় আর যখন আদম সৃষ্টি হয় তখন আবার সে মাটিতে পরিণত হবে। ..... ইহাই ঐ বিনয় যদ্বারা নবী সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে ওলী জাগরিত হয়। সুতরাং এমন মাটি থেকে আপনারাও জাগ্রত হোন। স্বয়ং আদমে পরিণত হোন আবার আদম থেকে পরে মাটি হয়ে যান এবং পরে আপনার মাটি থেকে আরও আদম সৃষ্টি হবে। ইহা ঐ পর্যায় যখন আমাদের খুব বেশী বেশী এবং বারে বারে নতুন নতুন মানুষ সৃষ্টির প্রয়োজন। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন" (প্রাগুক্ত)।

এভাবে কাজ বন্টনের মধ্যে এই কল্যাণ রয়েছে যে, যারা এক কিনারার আহমদী (অর্থাৎ সুবিধাবাদী দুর্বল আহমদী -অনুবাদক) এসব লোকদের মধ্যেও একটি জীবন সৃষ্টি হবে এবং একটি আত্মা সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর ঐসব লোক যারা খুবই আলস্য ও অবহেলায় জীবন অতিবাহিত করে তাদের ওপরে যদি দায়িত্ব অর্পণ করা যায় তাহলে ঐসব লোকও উৎসাহের সাথে ধর্মীয় কাজে সম্মুখে এগিয়ে আসবে। সুতরাং হুযূর (আইঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন,

"আমার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা এই যে, আহমদী জামাতে যারা জন্মগত আহমদী যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওপরে দায়িত্ব অর্পণ করা না হয় তাদের (সুপ্ত গুণাবলীর) বিকাশ ঘটে না। তাদের যোগ্যতাসমূহ সুপ্ত থাকে। কতক এমন আছে যে, তাদের দেখলে মনে হয় যেন তারা কিনারার আহমদী তাদের নিকট থেকে কি কোন কাজ আশা করা যেতে পারে ? কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা এ আশ্চর্যজনক স্বভাব নিহিত রেখেছেন যে, যখন মু'মিনের ওপরে দায়িত্ব চাপানো হয় তখন আরও উন্নতি করে। দায়িত্বও এমন এক দায়িত্ব যা পালন করে সে অধিক বরং পা-তে পরিণত হয়ে আরও ক্ষিপ্র বেগে চলতে থাকে ..... অতএব এদিক থেকে কাজ দু'ভাবে হতে পারে যা কিনা অবশ্যই আমাদের সবদিকে এবং সকল স্থানে আরম্ভ করতে হবে। প্রথমতঃ ঐসব আহমদী যারা এখনও দুর্বল এবং

সংখ্যায়ও অধিক, তাদের যে দুর্বলতাসমূহ অর্থাৎ- যাদের কাজ করার অভ্যাস নেই আর তাদের ওপরে কোন দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয় নি- এখন সময় এসে গেছে যে, প্রত্যেক আহমদীকে কাজে লিপ্ত করে নাও" (প্রাগুক্ত)।

চতুর্থতঃ তসবীহ্ (আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য বর্ণনা), তাহমীদ (আল্লাহ্‌র প্রশংসা কীর্তন) ও ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)

আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমে বলেছেন, যখন বিজয় ও সফলতার দিন আসে তখন- ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা ওয়াসতাগফিরহু ইন্নাহু কানা তাওওয়াবা (সূরা নাসর) অর্থাৎ ঐ সময় তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রশংসা কীর্তনের সাথে সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনায় বিভোর হয়ে যাও। আর মুসলমানদের তরবীয়তে যেসব শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়েছে এগুলোর ওপরে ঐ খোদা থেকে আবরণ ফেলে দেবার জন্যে দোয়া করতে থাকো। তিনি অবশ্যই স্বীয় বান্দার প্রতি করুণার সাথে দৃষ্টি দান করে থাকেন।

অতএব আজ নিশ্চিৎভাবে বিজয়ের দিন এসে গেছে। এখন খোদাতাআলার প্রশংসা ও মহিমা কীর্তন খুবই আবশ্যক যেন আমরা এ বিজয়ের প্রকৃত অধিকারী হতে পারি। আবার ইস্তেগফার করাও আবশ্যক এই বলে যে, হে খোদা! আমরা তো তোমার দুর্বল বান্দা। তোমার নিকট থেকেই আমরা শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করে থাকি। আমাদের তুমি সৌভাগ্য দান করো যেন আমরা সত্যিকার অর্থে এ নতুন আগমনকারী জাতিসমূহকে হেফাযত করতে সক্ষম হই। তাদেরকে পুণ্য পথে চালাতে পারি এবং তাদের মধ্য থেকেই তাদের শিক্ষক তৈরী করে দাও। আর এসব চেষ্টা-প্রচেষ্টায় যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায় সেগুলো তুমি স্বীয় অনুগ্রহে দূর করে দাও। আর তাদের তরবীয়তের ব্যাপারে কোন প্রকার কমতি সৃষ্টি হতে দিও না এবং এ ব্যাপারে আমাদের যেসব শিথিলতা রয়েছে ও আলস্য রয়েছে সেগুলোকে তুমি স্বীয় অনুগ্রহে ঢেকে দিয়ে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের নিকট থেকে এগুলো দূর করে দাও। সুতরাং হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

"অতএব এগুলো হলো সেই দোয়া যেগুলোর দিকে আমি জামাতকে আহ্বান করছি এবং আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, দুনিয়াতে যেসব পরিবর্তন সূচিত হতে যাচ্ছে সেগুলো হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দাসগণের দোয়ার মাধ্যমে সাধিত হবে। তাদের মাধ্যমে সূচিত হবে যাদের চরম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ধৈর্য ধারণ করার সৌভাগ্য দান করেছেন যখন কিনা এসব ধৈর্যকে দোয়ার পরিণত করার দিন এসেছে তখন আল্লাহ্ ইলহামের মাধ্যমে বলেছেন যে, কী কী দোয়া করতে হবে [হুযূর আনোয়ার (আইঃ)-এর সমাপ্তি ভাষণ, ৩১ শে জুলাই, ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ]।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম আরও বলেন,

"এসব উদ্দেশ্য যা আমরা লাভ করতে প্রত্যাশী কেবল দোয়ার মাধ্যমেই লাভ হতে পারে। দোয়ায় বড়ই শক্তি নিহিত। ..... খোদাতাআলা আমাকে বারে বারে ইলহামের মাধ্যমে ইহাই বলেছেন যা কিছু হবে দোয়ার মাধ্যমেই হবে। আমাদের অস্ত্র তো দোয়াই। এতদ্ব্যতিরেকে আমার নিকট আর কোন অস্ত্র নেই" (মলফুযাত, নবম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮)।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ! প্রত্যেক সংগ্রামে জয়লাভ করার জন্যে দোয়া আবশ্যক। সফলতা লাভও দোয়ার দ্বারাই হয়ে থাকে এবং উহার হেফাযতও দোয়ার দ্বারাই হবে। সুতরাং তরবীয়তের প্রথম ও শেষ অস্ত্র হলো দোয়া।

পঞ্চমত ঃ এম, টি, এ

আল্লাহ্‌তাআলা মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে তরবীয়তের সমস্যাকে কতইনা সহজ করে দিয়েছেন ! আমাদের প্রিয় নেতা সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীনের প্রত্যক দিনের প্রচারিত প্রোগ্রাম দেখা ও শুনার ব্যবস্থা হয়ে গেলে তরবীয়ত খুবই সহজ সাধ্য হবে। ইহা আমাদের সৌভাগ্য যে, আমাদের জীবনে এ (রূহানী) খাদ্য আল্লাহ্‌তাআলা আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেছেন। আমরা নিজেরাও এথেকে পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ করি এবং নওমুবাঈন (নবদীক্ষিত)-দিগকে এবং গয়ের জামাতের বন্ধুদিগকে প্রোগ্রাম দেখানোর বন্দোবস্ত করি। হুযূর আনোয়ার (আইঃ)-এর এ নির্দেশ সর্বদা আমাদের স্মরণ থাকা উচিতঃ

"আমি বিশ্বের সকল জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, অন্যান্য লোকদের ন্যায় টেলিভিশনে আমাকে দেখার ও আমার কথা শুনার যেভাবে উৎসাহ সৃষ্টি হচ্ছে, যদি তারা এক/দুই বার শুনে ফিরে যান তাহলে কিছুই লাভ হবে না। আমাদের চেষ্টা করা উচিত, যে-ই আসুক না কেন যেন রীতিমত আসে এবং আমাদের হয়ে যেন থেকে যায়..... এ ধারাকে সার্বজনীন করার জন্যে চেষ্টা করুন..... সহযোগী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাকে সাহায্য করুন তাহলে বাড়তি পুণ্য লাভ হবে" (জুমুআর খুতবা, জানুয়ারী, ১৯৯৩ সন)।

সম্মানিত শ্রোতা বন্ধুরা ! আজ আমাদের প্রত্যেককে ধর্মের সেবায় আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক। খোদা আমাদের যেভাবে সৌভাগ্য দেন আমরা ঐ ভাবেই স্বয়ং উৎসর্গ করি। সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন, *"আমার মন সায় দেয় না যে, আরও বিলম্ব করা হয়। এমন মানুষকে নির্বাচিত করা হোক, যে দুঃখ-কষ্টপূর্ণ জীবনকে বেছে নেবার জন্যে প্রস্তুত হয় আর তাকে বাইরে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়"* (মলফুযাত, ৯ম খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা)।

তিনি আরও বলেন,

"অতএব তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখো তারা দেখছো যে, খোদার জন্যে আমি জীবনকে উৎসর্গ করাকে স্বীয় জীবনের আসল উদ্দেশ্য মনে করি। আবার তোমরা নিজেদের অভ্যন্তরে তাকিয়ে দেখো যে, তোমাদের মধ্যে কতজন আছে যারা নিজেদের জন্যে আমার এ কার্যক্রমকে পসন্দ করে থাকো এবং জীবনকে উৎসর্গ করাকে প্রিয় মনে করে থাকো" (মলফুযাত ২য় খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা)।

আহমদী জামাত কোন্ গুণাবলীর ওপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক এ প্রসঙ্গে হুযূর (আইঃ) বলেনঃ

"আল্লাহ্‌তাআলা প্রত্যেক যুগে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। সুতরাং এ যুগেও তিনি স্বীয় আশিসক্রমে এ জামাতকে এজন্যে প্রতিষ্ঠিত করছেন যেন তিনি ইসলামের জীবন্ত ধর্ম হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষী হন আর যেন খোদার তত্ত্ব-জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর এমন দৃঢ় প্রতীতী জন্মে যা কিনা পাপ ও নোংরামীকে ভস্মীভূত করে দিয়ে যায় এবং পুণ্য ও পবিত্রতাকে বিস্তার দান করে" (মলফুযাত, ৯ম খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে সৌভাগ্য দিন যেন আমরাও আহমদী জামাতের সত্যিকারের সেবক হয়ে নতুন আগমনকারীদেরকে সেই মার্গে প্রতিষ্ঠিত করার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাই।

(১৭-৬-৯৯ তারিখের সাপ্তাহিক বদর-এর সৌজন্যে)

অনুবাদ- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আহমদীয়তের বিশ্বব্যাপী বিস্ময়াতীত অগ্রগতির হৃদয়গ্রাহী বিবরণ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ইংল্যান্ডের ৩৪ তম (আন্তর্জাতিক) সালানা জলসা বিগত ৩০, ৩১ জুলাই এবং ১লা আগষ্ট ১৯৯৯ ইং ইসলামাদে-টিলফোর্ডে অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় (আল্-হামদুলিল্লাহ্)। উপস্থিতি সংখ্যা ছিল ২১ হাজারের উর্ধ্বে। জলসার সমগ্র কার্যক্রম এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে (স্যাটেলাইট সিস্টেমে) বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারিত হয়। এ হিসেবে জলসায় দর্শক-শ্রোতাদের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে বহু লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) জুমুআর খুতবা ব্যতীত উদ্বোধনী ভাষণ, মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, দ্বিতীয় দিনের অপরাহ্ন অধিবেশনের ভাষণ, এবং তৃতীয় দিনে সমাপনী ভাষণ দান করেন, তাছাড়া এ জলসায় তৃতীয় দিনে যোহর নামায আদায়ের আগে আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং তাঁর হাতে বিশ্বব্যাপী এবছর ১ কোটি ৮ লক্ষ ২০ হাজার ২২৬ সংখ্যক লোকের বয়াত গ্রহণ করার পর সিজদা শোকরানা আদায় করেন। দ্বিতীয় দিনের প্রায় ৩ ঘন্টা স্থায়ী ভাষণে হুযূর (আইঃ) আহমদীয়তের বিশ্বব্যাপী তৎপরতা ও বিস্ময়াতীত সাফল্যের হৃদয়গ্রাহী বিবরণ পেশ করেন। সংক্ষেপে তা থেকে কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

এ বছর ৪টি নুতন দেশের সংযোজন ঃ সর্বমোট ১৫৮ টি দেশে আহমদীয়ত ঃ

খোদাতাআলার ফযলে এপর্যন্ত ১৫৮ টি দেশে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বছর যে নুতন চারটি দেশ আহমদীয়তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলো হলো, (১) চেক রিপাবলিক (২) স্লোভাক রিপাবলিক (৩) ইকুয়েডর এবং (৪) এসোথো। জার্মানী জামাতের এক্ষেত্রে খেদমত বিশেষ মর্যাদা রাখে। ইতঃপূর্বে তারা নতুন ছয়টি দেশে জামাত কায়েম করেছিলেন ঃ বুলগেরিয়া, বোসনিয়া, রুমানিয়া, স্লোভেনিয়া, মেসেডোনিয়া এবং ক্রোশিয়া। আল্লাহ্র ফযলে এবছর তারা বাকী দু'টো দেশ স্লোভাক রিপাবলিক ও চেক রিপাবলিকেও সফলতা লাভ করেন। ইকুয়েডরে আহমদীয়ত বিস্তার এভাবে ঘটে যে, কানাডায় ঐ দেশের এক ব্যক্তি নাসের আহ্মদ আহমদী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে ইকুয়েডরে যান। সেখানে তাঁর দাওয়াত ইলাল্লাহ্র দরুন আল্লাহ্র ফযলে একটি কট্টর রোমান ক্যাথলিক পরিবারের পাঁচ ব্যক্তি সর্বপ্রথম আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। তারপর এই ধারা এখনও অব্যাহতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। লেসোথো-তে জামাত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দক্ষিণ আফ্রিকার জামাতের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। তারা এবছর তাতে আল্লাহ্র ফযলে সফল হয়েছেন। তাছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা জামাত সোওয়াজীল্যান্ডেও তবলিগী দল পাঠিয়ে কাজ আরম্ভ করেছে। আমেরিকার জামাত জ্যামাইকায় জামাত কায়েম করেছেন।

মিশন হাউস (তবলীগী কেন্দ্র) ঃ

আফ্রিকা এবং ইন্ডিয়ার জামাত এক্ষেত্রে সবচে' অগ্রগামী। আমেরিকায় বৃহদায়তন প্রচার-কেন্দ্র রয়েছে ৩৬টি এবং কানাডায় ১০টি। এবছর আমেরিকায় ভার্জেনিয়া রাজ্যের উত্তরাংশে অতি উত্তম একটি এলাকায় ৪.৭ একর পরিমাণের প্লট সাড়ে তিন লাখ ডলার মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে। এখন সেখানে মসজিদ ও তবলিগী কেন্দ্রের নক্শা তৈরী করা হচ্ছে। ওয়াশিংটনের মসজিদ সংলগ্ন ৪০ একরের একটি প্লট ক্রয় করা হয়েছে, যা ইসলামের প্রচারে ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রয়োজন মেটাতে সহায়ক হবে। কানাডায় এ বছর মিসিসাগায় এক উত্তম অবস্থানে নির্মিত সুরম্য অট্টালিকা সুলভ দামে ক্রয় করা হয়েছে। এ প্রসাদটি ৫.১৬ একর পরিমাণ ভূখন্ডের উপর নির্মিত। এর কেবল ছাদ দেওয়া অংশটুকুই হচ্ছে ২৮ হাজার বর্গফুট। ২শ' গাড়ি পার্কিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে। বড়ো একটি হল রয়েছে যেখানে একসঙ্গে ১২শ' মুসল্লি নামায আদায় করতে সক্ষম। ৪০টি অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রত্যেকটি সবরকম ফার্নিচারসহ সুসজ্জিত। সমগ্র প্রাসাদটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং অত্যন্ত ভাল অবস্থায় রয়েছে। উক্ত অট্টালিকাসহ এ প্লটটি ১৯ লাখ ৯৫ হাজার ডলার মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে কানাডা জামাত তিন মাসের মধ্যে বিশ লাখেরও অধিক ডলার অনুদান সংগ্রহ করেছেন। মহিলারা তাদের বিপুল পরিমাণ অলঙ্কার পেশ করেছেন (আল্ হাম্দুলিল্লাহ্)। দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ বিপুল সংখ্যক নামাযীও সেখানে দান করেন।

জার্মানীতে একশত মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা ঃ

এ যাবৎ সাতটি উপযুক্ত স্থানে মসজিদ নির্মাণের জন্যে নুতন প্লট ক্রয় করেছে। এ উপলক্ষে ২৬ লাখ ৯৭ হাজার ৫শ ৪৫ জার্মান মার্ক ব্যয় করা হয়েছে। এ পরিকল্পনাধীনে 'বিট্লিস' শহরে প্রথম মসজিদ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছে (উল্লেখযোগ্য যে, ইতঃপূর্বে হেমবুর্গ ও ফ্রাঙ্কফোর্টে জামাত কর্তৃক নির্মিত মসজিদ রয়েছে এবং বহু এলাকায় ক্রয়কৃত বড় বড় ইমারত ও কমপ্লেক্স রয়েছে, যেখানে নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে নিয়মিত নামায আদায় করা হয়।

ইংল্যান্ড জামাতও ব্রেডফোর্ডে মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে এক খন্ড জমি কিনেছে এবং অন্যান্য শহরেও উপযুক্ত প্লটের খোঁজ করা হচ্ছে। তাছাড়া লন্ডনে নবস্থাপিত বিশাল কেন্দ্রীয় মসজিদের কাজও এগিয়ে যাচ্ছে।

নরওয়ের বৃহত্তর মসজিদের নির্মাণ কাজও শুরু হয়েছে।

সুইডেনে 'মসজিদে নাসের'-এর সম্প্রসারণ কাজও শুরু হয়েছে।

কানাডায় মসজিদ-দারুল ইসলাম সংলগ্ন গৃহসংস্থানের বরকতপূর্ণ বিশাল ব্যবস্থা ঃ

মসজিদ 'বায়তুল-ইসলাম' সংলগ্ন পঞ্চাশ একর জমির ওপর একজন বিল্ডার গৃহ নির্মাণের পরিকল্পণা গ্রহণ করেন। সেখানে যাতে সুলভ দামে নিজেদের রুচিসম্মত গৃহ অধিকতর সংখ্যাক আহ্মদীরা ক্রয় করতে পারেন সে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ যাবৎ একশ'রও অধিক আহমদী পরিবার সেখানে গৃহ ক্রয় করেছেন। 'মসজিদ বায়তুল ইসলাম' পৌছতে তাদের মাত্র ২থেকে ৫মিনিট সময় লাগবে। এই গৃহসংস্থান পরিকল্পণাটির নাম হচ্ছে 'দারুল-আমান'। কোন কোন মহলের বিরোধিতা সত্ত্বেও সিটি কাউন্সিল এই পরিকল্পণাধীন সমস্ত সড়কের নাম জামাতের প্রস্তাব অনুযায়ী অনুমোদন করেছেন। সড়কগুলোতে ঐ সব নামের ফলক স্থাপিত হয়েছে এবং এই এলাকায় সরকারী নক্শায় ঐ সকল নাম ছাপা হয়েছে। তাছাড়া 'মসজিদ বায়তুল ইসলামে'র দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত অনেক বড় একটি পাবলিক পার্কের নাম সর্বসম্মতিক্রমে টাউন কাউন্সিল কর্তৃক 'আহমদীয়া পার্ক' রাখা হয়েছে।

বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ঃ

এ যাবৎ ৫২টি ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কাশ্মীরী ভাষায় অনুবাদটি নুতন সংযোজন। কেনিয়া এবং ইন্ডিয়ার দু'টি আঞ্চলিক ভাষায় প্রণীত অনুবাদ প্রকাশনার পথে রয়েছে। উল্লেখিত ৫২টির মধ্যে ৯টি ভাষায় অনুবাদ এ বছর সম্পন্ন হবার পর প্রকাশিত হয়। ইতঃপূর্বে ১০০টি ভাষায় কয়েকটি সূরা সমন্বয়ে আংশিকভাবে কুরআন করীমের অনুবাদ ছেপে প্রকাশ করা হয়েছিল। এখন সম্পূর্ণ কুরআনের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদসহ প্রকাশ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, কুরআনের অনুবাদের কাজ অত্যন্ত পরিশ্রম ও সময় সাপেক্ষ। এ ছাড়া ৮৯টি ভাষায় তরজমার কাজ বিভিন্ন স্তরে অব্যাহত হয়েছে।

বিভিন্ন ভাষায় বই-পুস্তক প্রকাশনা ঃ

এবছর ১১টি পুস্তকের অনুবাদ আলবেনীয়ান ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এবং ১১টির অনুবাদ বসনিয়ান ভাষায় হয়েছে। ৬টি পুস্তকের অনুবাদ জার্মান ভাষায় এবং ৫টির অনুবাদ উজবেক ভাষায় হয়েছে। তেমনি ৬টি পুস্তকের তরজমা

হওসা ভাষায় এবং ১১টির তরজমা টার্কিশ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। চীনা, ইংরেজী এবং খামীর ভাষায় চার চারটি পুস্তকের তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া রাশিয়ান, নরোজিয়ান, মালয়ালম, সোমালিয়ান, হৌসা, কোরিয়ান, মারাঠী, ইন্দোনেশিয়ান, ডেনিশ, চেক এবং আফ্রিকান বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত বিভিন্ন বই-পুস্তক ও ফোল্ডার প্রকাশিত হয়েছে এবং আরও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

লন্ডন থেকে ওকালতে ইশাআত (প্রকাশনা বিভাগ) কর্তৃক বিভিন্ন দেশে ২ লাখ ২১ হাজার ৬ শত ৪১টি বিভিন্ন বই-পুস্তক পাঠান হয়। বিভিন্ন দেশের জামাত কর্তৃক প্রকাশিত বই-পুস্তকের সংখ্যা ৬ লাখ ৮৪ হাজার ৫ শ'। ক্রমশঃ বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের ওপর এগুলোর গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

আহমদীয়া মুদ্রণালয় ঃ (১) ইসলামাবাদ টিলফোর্ডস্থ 'রাকীম প্রেস' থেকে প্রকাশিত বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ১ লাখ ৬৬ হাজার ২ শ ১০। (২) ঘানা, নাইজেরিয়া, গাম্বিয়া, সিয়েরালিওন, আইভোরী কোষ্ট ও তাঞ্জানিয়ায় অবস্থিত উন্নত মানের আধুনিক মুদ্রণালয়গুলো থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাবলীর সংখ্যা ২লাখ ১২হাজার ২৯। এই সমস্ত দেশের এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সরকারী ও বেসরকারী প্রকাশনার প্রয়োজন পূরণেও প্রায়শঃ এ মুদ্রণালয়গুলো সহায়ক হয়ে থাকে।

এম. টি. এ.-এর নুতন যুগে প্রবেশ লাভ ঃ

ইউরোপের সবচে' প্রখ্যাত একটি সেটেলাইটের মাধ্যমে ডিজিটেল চ্যানেলে এম. টি. এ. এখন উহার অহোরাত্র প্রোগ্রাম সম্প্রচার করছে। এর পাশাপাশি উহার এনালগ সম্প্রচারও অব্যহত রয়েছে। এবং সাউথ পেসেফিক (অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিজি, জাপান ইত্যাদি)-এর জন্যে এরূপ আরেকটি সেটেলাইটে এম. টি.এ.-এর চ্যানেল কার্যকর রয়েছে, যে সেটেলাইটের মাধ্যমে বি.বি.সিও উহার ওয়ার্ল্ড সার্ভিস সম্প্রচার করে থাকে।

এম. টি. এ.-এর এখন ১৪টি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, যেগুলোতে সর্বমোট ১৩৫জন স্বেচ্ছাসেবী দৈনিক পালাক্রমে ২৪ ঘন্টা ট্রান্সমিশনের জন্যে বিভিন্নভাবে খিদমত পালন করে যাচ্ছেন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-সেবার বিশ্বব্যাপী-বিস্তার ঃ

৩৭ টি দেশে ৪০৭টি হোমিও দাতব্য চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে এক লক্ষ একষট্টি হাজার তিনশ' ছয় জন রুগীর চিকিৎসা করা হয়। ইউরোপে ইংল্যান্ড ও জার্মানীর জামাত এবং আফ্রিকায় ঘানা জামাত একাজটির সংগঠনিকরূপে অগ্রগতি সাধন করে। ঘানায় ৩২টি এবং ইন্দোনেশিয়ায় ১৯৮টি ছোট-বড় হোমিও চিকিৎসা-কেন্দ্র কাজ করছে।

* ৩৭টি দেশে সেখানকার রেডিও ও টিভিতে জামাতের ২হাজার একশ' চল্লিশটি অনুষ্ঠান প্রচারিত এবং ১৪৮ টি পত্র-পত্রিকায় জামাত সম্পর্কিত সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

* অসংখ্য এতীম, অনাথ ও গরীবদের সাহায্যদান করা হয়। সিয়েরালিওন, বসনিয়া ও আলবেনিয়ায় বিশেষতঃ ইংল্যান্ড ও জার্মানী জামাত কর্তৃক ব্যাপক সাহায্য সামাগ্রী পাঠান হয় এবং খোদ্দাম কর্তৃক ত্রাণ তৎপরতা চালান হয়।

দাওয়াত ইলাল্লাহ (তবলীগ) ঃ

* ভারতে এবছর ১০২০টি নুতন জামাত ও ৯ টি প্রচারকেন্দ্র কায়েম হয়। ১৪টি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়। ১৭ লক্ষ ১০ হাজার ৩শ' ১৪টি বয়াত হয়। যা বিগত বছরের চে' দ্বিগুণ। হিমাচল প্রদেশে নবদীক্ষিত আহমদীদের ফিরাবার ও বাধা দেবার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান থেকে মঞ্জুর চিনিটির পাঠান এক মৌলবী দারুণভাবে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় এবং অবশেষে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। চিনিউটি তার ভিসা করিয়ে এ কাজের জন্যে তাকে ১৫ হাজার টাকাও দিয়েছিল।

* ঘানায় ১২৯ স্থানে বিপুল সংখ্যক লোক বয়াত করেন। ১২৯টি নুতন মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

* আইভরীকোষ্টে ১১৯৫টি স্থানে নুতন জামাত কায়েম হয়। ১২৫টি পূর্বনির্মিত মসজিদও জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৭টি নতুন প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ৪৭৩ জন চীফ এবং ৩২০ জন ইমাম (আলেম) বয়াত করেন।

* বুর্কিনাফাসোতে ৭৭৭টি মকামে জামাত কায়েম হয়। ৮১০টি নুতন মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং পূর্বনির্মিত ৮০৮টি মসজিদ অন্তর্ভুক্ত হয়। ৮১১ জন ইমাম আহ্‌মদীয়তে বয়াত হন। মাত্র 'ডোলি' অঞ্চলেই ৬ লক্ষ ৫০ হাজার লোক আহ্‌মদীয়া জামাতভুক্ত হন।

* কেনিয়ায় ১১৩টি স্থানে আহমদীয়ত বিস্তার লাভ করে। ১০৭টি নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়। পুর্বনির্মিত ৬টি মসজিদ অন্তর্ভুক্ত হয়। এ বছর এদেশটিতে ১০ লক্ষ ৩শ' ২৮ জন ব্যক্তি বয়াতগ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন। সেখানে 'কাদিয়ান' নামে একটি খ্রীষ্টান প্রধান এলাকায় ২৬টি মকামে ৩০ হাজার লোক আহ্‌মদীয়ত গ্রহণ করেন। সেখানকার টাউনে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

* তাঞ্জানিয়ায় ৫৪টি মকামে ৫ লক্ষ লোক আহ্‌মদীয়া জামাতে দীক্ষিত হন।

* সিয়েরলিওনে মাত্র দু'মাসে ৪৩টি স্থানে নতুন জামাত কায়েম হয়। ১৯টি পূর্বনির্মিত মসজিদ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

* সেনেগালে ১৮টি স্থানে ২৮টি মসজিদসহ ২ লক্ষ ব্যক্তি আহমদীয়া জামাতভুক্ত হয়।

* বেনীনে ৫ হাজারের টার্গেট দেয়া হয়েছিল। তারপর প্রথমে ৩৫ হাজার এবং পরিশেষে বয়াত সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩শ' ৬৫ জনে উন্নীত হয়।

* টোগোতে ১৫ হাজারের টার্গেট দেয়া হয়েছিল। ১৫ হাজার তারপর ৩০ হাজার, তারপর ৫০ হাজার, তারপর ১ লাখ ১০ হাজার ৬শ' ৫৭টি বয়াত অনুষ্ঠিত হয়।

* বাংলাদেশে দলে-দলে মানুষ বাসে করে কেন্দ্রে আসতে থাকেন এবং আলোচনা, প্রশ্নোত্তর-সভা ইত্যাদির পর তাদের অধিকাংশ বয়াত গ্রহণ করেন। আহমদীদেরকে নিয়মিতভাবে গরীবদের মধ্যে ঈদুল আযহায় কুরবানীর গোস্ত বিতরণ করতে দেখে একজন মসজিদের ইমাম বয়াত করে জামাতভুক্ত হন।

* ইন্দোনেশিয়ায় ১৫ টি নুতন স্পটে ২৩ হাজার ৩শ ১২জন লোক বয়াতগ্রহণ করেন। ১০টি নতুন মসজিদ তৈরী হয়।

* ফ্রান্সে এই প্রথম উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বয়াত অনুষ্ঠিত হয়।

* এ বছর ৩৩৬১টি নতুন জামাত কায়েম হয় এবং ১৫২৪টি বৃদ্ধি পায়। তন্মধ্যে ২২৩টি নুতন নির্মাণ করা হয়। অবশিষ্ট পূর্বনির্মিত অবলীলায় লাভ হয়।

* বিগত ১৫ বছরে মসজিদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬৩৬। এ বছর তবলিগী কেন্দ্র (কমপ্লেক্স)-এর সংখ্যা ৫৬টি বেড়েছে এবং বিগত ১৫ বছরে ৮৪টি দেশে তবলিগী কেন্দ্রের সংখ্যা হয়েছে ১০৮টি।

* এ যাবৎ ওয়াক্‌ফে নও শিশুদের সংখ্যা ১৯১৪৩ জন। তন্মধ্যে ১৩,২৮৭ জন ছেলে এবং ৫,৮৫৬ জন মেয়ে।

* **আর্থিক কুরবানী ঃ** শুধুমাত্র লাযেমী চাঁদার খাতে ২ কোটি ২৫ লক্ষ ৭২ হাজার পাউন্ড। অন্যান্য সব চাঁদা যোগ করলে ৩ কোটি পাউন্ড ছাড়িয়ে যাবে।

* **এবছর মোট বয়াত সংখ্যা ঃ** এক কোটি আট লক্ষ বিশ হাজার দু'শ ছাব্বিশ জন। যারা ১০৪টি দেশের ২৩১টি জাতির থেকে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের অন্তর্ভুক্ত হলেন, 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

* ফ্রেঞ্চ স্পিকিং অঞ্চলে '৯৮ সন থেকে এযাবৎ এক কোটি ১১ লক্ষ ৩ শ' ১১টি বয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইংলিশ স্পিকিং অঞ্চলে সে তুলনায় কিছু কম আছে।

ক্যাসেট থেকে সংকলন ও অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

কাদিয়ান-দারুল আমান

কাদিয়ানের ইতিহাস

আব্দুর রশিদ আর্কিটেক্ট, চেয়ারম্যান
ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েসন অব আহমদী আর্কিটেক্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স

(২য় সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

দরবেশগণ সম্পর্কে ধারণা ও মতামত

হযরত ভাই আব্দুর রহমান কাদিয়ানী ও সাহেবযাদা মির্যা যাফর আহমদ দরবেশগণ সম্পর্কে লেখেন যে, তাদের মধ্যে অসাধারণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র স্মরণে কুরআন তিলাওয়াত, মানবতার সেবায় ও বেহেশ্‌তী মকবেরা দেখাশুনার ব্যাপারে নিষ্ঠার সাথে নিমগ্ন রয়েছেন। তারা কাদিয়ানে অবস্থানকে তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র আশীষ বলে মনে করে।

নুতন দিল্লীর দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা মিঃ এইচ আর ভোহরা ১৯৪৮ সালের ১৭/১৮ ই নভেম্বর সংখ্যায় লেখেন, "তাদের নীতিতে তাদের অবিচল আস্থা ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাদের সহনশীলতার দরুন প্রথম দিকে সরকারের বিরূপ মনোভাব ও অমুসলিম বাস্তুত্যাগীদের শত্রুতা সত্ত্বেও কাদিয়ানে এখনো ৩১৩ জন বিশ্বস্ত আহমদী রয়েছে। বর্তমানে তারা আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল না হওয়া সত্ত্বেও পূর্বের ন্যায়ই বিপুল সংখ্যক অমুসলিম দুঃস্থকে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে।"

জলন্ধরের দৈনিক পত্রিকা "আরীয়া বীর" ১৯৫৪ সালের ২৪শে মে সংখ্যায় সালানা জলসা সম্পর্কে লেখে, "বক্তৃতাগুলি ছিল জ্ঞানগর্ভ ও ইসলামিক এবং এগুলো ছিল কুরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত। তাদের শৃংখলা, প্রচারের ধরন ও নামাযে সময় নিষ্ঠা প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য। আর্য্য সমাজীদের সম্মেলনে উপস্থিতি কখনো এতখানি আকর্ষণীয় ছিল না।" আর্য্যসমাজীদের অন্য এক নেতা লালা জগৎ নারায়ণ *(প্রধান সম্পাদক, হিন্দু সমাচার)* পাঞ্জাবের শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে স্বীকার করেন যে, আহমদীদের মধ্যে মহান ঐতিহ্য রয়েছে ও বিশ্বজুড়ে তারা সুনাম অর্জন করেছে। তাই ভারত তাদের সম্পর্কে গর্বিত *(বদর, ২০শে অক্টোবর, ১৯৫৬ ইং)*।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপ সিংহ কিরণ তার এক বক্তৃতায় মন্তব্য করেন, "আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আহমদীয়া জামাতের ধৈর্য ও উদারতায় আমি অভিভূত হয়েছি। আমি মনে করি কেউ তাদের প্রসার বন্ধ করতে পারবে না। আহমদীরা ইউরোপবাসী ও অন্যান্য উন্নত দেশের নিকট থেকে অভ্যর্থনা পাওয়ার যোগ্য। মানবতা ও ধৈর্যের মূল্যবোধ যাতে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় সে লক্ষ্যেও আহমদীদেরকে তাদের শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। আহমদীয়া সম্প্রদায় যেভাবে ইসলামের শিক্ষাকে উপস্থাপন করেছে তাতে ইসলামের ভিত্তিকে মজবুত করা হয়েছে" *(বদর, ২রা আগষ্ট, ১৯৬২ ইং)*।

তাদের রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে ভারত সরকার মরিসাসের আহমদীয়া জামাতকে জানায় যে, "আহমদীরা একটি মজবুত সম্প্রদায়। তারা কাজে বিশ্বাসী। তারা দ্রুতগতিতে উন্নতি করছে। তাদের সংগঠন অত্যন্ত সুশৃংখল। তাদের পুরুষরা শতকরা একশত ভাগ ও মহিলারা ৭৫% শিক্ষিত। তাদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতার গভীরবোধ। তাদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী, যা বাস্তবায়ন করতে তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। তাদের সকলেই উৎসাহী শিক্ষক" *(লি প্রগ্রেস ইসলামিক, মার্চ ১৫, ১৯৫৮ইং)*।

নামধারী সম্প্রদায়ের নেতা সর্দার জগজীৎ সিং কাদিয়ানে এক বক্তৃতায় বলেন, "ভারতের বাইরে আমি আহমদীদেরকে পর্যবেক্ষণ করেছি যে, তারা কথার চেয়ে কাজে বেশী বিশ্বাসী। তারা সুষ্ঠু ও নিষ্ঠাপূর্ণ কাজ করেছে। কেউ তাদের উন্নতি প্রতিরোধ করতে পারবে না" *(বদর, ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ ইং)*।

প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ তাঁর জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, "বিদ্বেষ পরিহার কর এবং মানুষের সাথে সহানুভূতি ও ভালবাসার সাথে আচরণ কর। পুণ্যের সকল পথে চেষ্টা কর। কারণ বস্তুতঃ তোমাদের ধারণা নাই, কোন্ পথে তোমরা গৃহীত হবে। আনন্দিত হও। কেননা, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যের ময়দান তোমাদের জন্যে উন্মুক্ত ও খালি। যতদূর চাও এ ময়দানে তোমরা অগ্রসর হতে পার। আজ পৃথিবীর সকল জাতি তাদের সম্পূর্ণ শক্তি পার্থিব আসক্তিতে নিয়োজিত করেছে। কেউই প্রভুর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বস্তুসমূহের প্রতি আদৌ কোন ভ্রুক্ষেপ করছে না। যে সকল লোক পূর্ণ ঐকান্তিকতার সাথে এ দরজা অতিক্রম করতে ইচ্ছুক তাদের জন্যে এ সময়টি সাহস দেখিয়ে পুরস্কার লাভের এক বিরল সুযোগ এনে দিয়েছে" *(আল্ ওসীয়্যত- পৃষ্ঠা ১৩)*।

প্রতিশ্রুত মসীহের তিরোধান

প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ১৯০৮ সালের এপ্রিলের শেষ দিকে বায়ু পরিবর্তনের জন্যে কাদিয়ান থেকে লাহোর গমন করেন। তাঁর স্বাভাবিক নিয়মে প্রায় এক মাস তিনি ইসলামের সেবায় মনোনিবেশ করেন। প্রতিশ্রুত মসীহ্ প্রত্যহ সন্ধায় তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েসহ ফিটন নামক একটি ঘোড়ার গাড়ীতে মুক্ত বায়ু সেবনের জন্যে বাইরে যেতেন। ১৯০৮ সালের ২৫ শে মে সন্ধ্যায় যখন তিনি, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা বাইরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত তখন প্রতিশ্রুত মসীহ্ মিঞা আব্দুর রহমানকে ডেকে বল্‌লেন, "গাড়ীর চালককে বল আমাদের নিকট এক টাকা আছে এবং এ ভাড়ার মধ্যে সে আমাদেরকে যতখানি দূরত্বে নিয়ে যেতে চায় ততখানি দূরত্বে গিয়ে ফিরে আসবে" *(আসহাবে আহমদ, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭৮)*।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ইতোমধ্যে কয়েকটি ওহী লাভ করেন যে, পৃথিবী থেকে তাঁর প্রস্থানের সময় নিকটবর্তী। ১৯০৮ সালের ২৫শে মে তাঁর শেষ গ্রন্থ 'পয়াগামে সুলেহ্' এর প্রণয়ন কাজ শেষ করার পর ঐ দিন সন্ধ্যায় হঠাৎ তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। সারা রাত তিনি তীব্র দুর্বলতা বোধ করেন। ১৯০৮ সালের ২৬ শে মে ভোর বেলায় তিনি নামাযের সময় হয়েছে কিনা জানতে চান। হ্যাঁ, সূচক উত্তর পাওয়ার পর তিনি বিছানাতেই ফজরের নামায পড়েন। ঐ দিন সকাল প্রায় সাড়ে দশটায় তিনি ইন্তেকাল করেন *(ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)*।

কিছুক্ষণ পর জামাতের সদস্যগণ একের পর এক সকলে আসেন এবং প্রতিশ্রুত মসীহের কপাল চুম্বন করেন। হুযূরের খাদেমগণ বাইরে অবস্থান করেন এবং শেখ রহমতুল্লাহ্, খাজা কামাল উদ্দীন, ডাঃ ইয়াকুব বেগ ও ডাঃ সৈয়্যদ মুহাম্মদ হোসেন লাহোরের সিভিল সার্জনের নিকট থেকে 'ডেথ্ সার্টিফিকেট' আনার জন্যে চলে গেলেন। ভাই আব্দুর রহমান, শেখ রহমতুল্লাহ্ ও অন্য একজন আহমদী বন্ধু প্রতিশ্রুত মসীহের

আশীষপ্রাপ্ত দেহ গোসল করিয়ে দিলেন। তাঁর মরদেহ অপরাহ্ন ২.৩০ এর মধ্যে জানাযার জন্যে প্রস্তুত করা হলো। অতঃপর দলে দলে আহমদী ও অআহমদীগণ আসতে থাকলেন ও বিদায়ী আত্মার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করতে থাকলেন। প্রতিশ্রুত মসীহের মুখমন্ডল ছিল উজ্জ্বল ও স্বর্গীয় জ্যোর্তিতে দীপ্ত। তাঁর গন্ডদেশ ছিল উজ্জ্বল লালচে রং এর। বাটালার জন্যে একটি ট্রেন রিজার্ভ করা হলো। প্রায় বিকাল ৪ ঘটিকায় প্রথমে মহিলাগণ রেল ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। অতঃপর চারপাইতে রাখা তাঁর দেহ আহমদীয়া বিল্ডিং থেকে লাহোর রেল ষ্টেশনে নেয়া হলো।

এখানে জামাত বিরুদ্ধবাদীদের একটি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে। কোন এক ব্যক্তি ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্টকে খবর দিল যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ কলেরায় মারা গেছেন। অতএব তিনি রিজার্ভ ট্রেনটি বাতিল করে দেন এবং ট্রেনে করে দেহ নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে রাজী হলেন না। যখন শেখ রহমতুল্লাহ্ লাহোরের সিভিল সার্জনের সার্টিফিকেট দেখালেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ কোন সংক্রামক ব্যাধিতে মারা যান নি তখন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও ষ্টেশন মাষ্টারের ভ্রমণের অনুমতি না দিয়ে কোন উপায় ছিল না। এতে করে বিরুদ্ধবাদীদের ঘৃণ্য চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। বিকাল ৫.৪৫ মিনিটে ট্রেনটি লাহোর থেকে বাটালার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। ট্রেনে মরদেহের সঙ্গে ছিল বাটালার প্রতিশ্রুত মসীহের পরিবারের সদস্যগণ, হযরত মৌলবী নূরুদ্দীন, হযরত মীর নাসের নবাব, হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খান ও বহু খাদেম। জনাব আব্দুল মজীদ সালেহ্ এর বর্ণনা অনুযায়ী মৌলানা আবুল কালাম আযাদ অমৃতসর থেকে লাহোরে আসেন এবং তিনি বাটালা পর্যন্ত মরদেহের সঙ্গে ছিলেন।

যখন ট্রেনটি লাহোর থেকে অমৃতসর পৌছলো তখন সেখানে মিঞা নাসির বখশ, সওদাগর ডাঃ আবদুল্লাহ্, কপুরথলা জামাতের সদস্যগণ ও হযরত মুন্সী যাফর আহমদ এর ন্যায় আরো অনেক আহমদী যোগদান করেন। ট্রেনটি রাত্রি ১০ টায় বাটালা পৌছে। মরদেহ প্রায় দেড় ঘন্টা রিজার্ভ কম্পার্টমেন্টে রাখা হলো। অতঃপর রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটায় তা প্লাটফরমের উপর রাখা হলো। সেখানে সব সময় খাদেমগণ উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৮ সালের ২৭ শে মে রাত্রি প্রায় ১২.৩০ মিনিটে মরদেহ রেলওয়ে প্লাটফরম থেকে সরিয়ে একটি আমগাছের নীচে রাখা হলো। এখানে বাক্সের মধ্যে বরফ দেয়া হয়েছিল। দুঘন্টা পর রাত্রি প্রায় ২.৩০ মিনিটে সকলে মিলে বাক্সটি কাঁধের উপর উঠিয়ে নিয়ে কাদিয়ানের পথে রওনা হলেন। জামাতের সদস্যগণ দিওয়ানাওয়ালী গ্রামের নিকট ফজরের নামায পড়েন। ক্যানাল ব্রিজের নিকটে পৌছার পর জামাতের আরো সদস্য শব মিছিলে যোগদান করেন। তারা সকাল ৯টায় কাদিয়ান পৌছেন এবং বেহেশ্তী মকবেরার বাগান সংলগ্ন গৃহে পবিত্র দেহ রাখা হয় (*তারিখে আহমদীয়ত তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬২-৫৭০*)।

প্রতিশ্রুত মসীহের মৃত্যু সংবাদ তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় লাহোর শহরে ছড়িয়ে পড়লো। সকল আহমদীয়া জামাতকে কাদিয়ান গিয়ে জানাযা পড়ার জন্যে সংবাদ দেয়া হলো। পরের দিন সকল পত্র-পত্রিকায় এ সংবাদ ছাপানো হলো। প্রতিশ্রুত মসীহ্ তাঁর আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে জামাতকে সতর্ক করেছিলেন এবং দু'বৎসর পূর্বে একটি ওসীয়্যত লিখেছিলেন। এতদ্সত্ত্বেও জামাতের সদস্যগণ সম্পূর্ণরূপে মুষড়ে পড়েছিলেন। জামাতের সদস্যগণ এ সত্য মেনে নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন যে, এরূপ একজন দরদী, ধার্মিক, স্বর্গীয় আশীষপ্রাপ্ত, সহানুভূতিশীল, উজ্জ্বল ও দীপ্ত চেহারার অধিকারী ব্যক্তি অকস্মাৎ তাদের মধ্য হতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। লাহোরের বাইরের জামাতগুলোকে টেলিগ্রামের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল। তারা কাদিয়ানের দিকে দৌড়াতে শুরু করলেন। কিন্তু প্রত্যেকে নিজ মনের গহীনে এ আশা লালন করছিলেন যেন সংবাদটি মিথ্যা হয়।

কাদিয়ানের অধিবাসীরা ছিলেন সম্পূর্ণ বিশৃংখল। তারা শোকে পাগল হয়ে পড়লেন। যদিও তারা খাজা কামালউদ্দীন ও মৌলবী মুহাম্মদ আলীর মাধ্যমে সংবাদটি পেয়েছিলেন তথাপি তারা এ বাস্তবতা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাদের সকলেই আশা করছিলেন যে, সম্ভবতঃ জামাতের কোন বিরুদ্ধবাদী এ সাংঘাতিক খবরটি ছড়িয়েছে। এমনকি একজন এ পরামর্শও দিলেন যে, সত্য ঘটনা জানার জন্যে কাউকে লাহোরে পাঠানো হউক। এরূপ বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে বহুলোক মসজিদে মুবারকের চারিদিকে জড়ো হলেন। চৌধুরী রহমতউল্লাহ্ কয়েকদিন পূর্বে লাহোরে ছিলেন। পরের দিন তিনি কাদিয়ান আসেন। তিনি জনতার নিকট হুযূরের অসুস্থতা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেন এবং বলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ পূর্বাহ্নেই আপনাদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। এতেই কাদিয়ানের লোকেরা বুঝতে পারলেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন।

যেখানেই এই দুঃখের সংবাদ পৌছল সেখানেই লোকেরা নিজেদেরকে অনাথ মনে করলো। এমন কোন চক্ষু ছিল না, যা অশ্রুতে পূর্ণ হয় নি। এমন কোন হৃদয় ছিল না, যা গভীর শোক-বিহ্বল ও বিষন্ন হয় নি। বিষন্নতার তীব্রতা এত গভীর ছিল যে, খলীফাতুল মসীহ সানী পরিস্থিতি এভাবে বর্ণনা করেন ঃ "প্রতিশ্রুত মসীহের সাথে জামাতের ভালবাসা এত গভীর ছিল যে, তারা তাঁর মৃতদেহ নিজেদের চোখের সামনে দেখেও তাঁর মৃত্যুর সত্যতা স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা এ কথা মেনে নিতে নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছে যে, তাদের প্রিয় ইমাম চিরদিনের জন্যে তাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। এই মসীহ ও পূর্বের মসীহের শিষ্যদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, পূর্বের মসীহের শীষ্যরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর জীবন্ত দেখে হতবাক হয়েছিল। পক্ষান্তরে আজকের মসীহের শিষ্যরা হতবাক হলো যে, তিনি মৃত। প্রথম মসীহের শিষ্যরা বুঝতে পারে নি কীভাবে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পরও বেঁচে গেলেন এবং আজকের মসীহের শিষ্যরা বুঝতে পারেন না কীভাবে ইহা সম্ভব যে, প্রতিশ্রুত মসীহ মৃত। প্রায় ১৩০০ বৎসর পূর্বে খাতামান্নাবীন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মৃত্যুতে একজন কবি বলেছিলেন ঃ

"*তুমি ছিলে আমার চোখের মণি। তোমার মৃত্যুতে আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছি। এখন যদি কেউ মারা যায় আমি পরোয়া করি না। কারণ আমি তোমার মৃত্যু সম্পর্কেই উদ্বিগ্ন ছিলাম।*"

আজ ১৩০০ বৎসর পর তাঁর মহান দাস ও আধ্যাত্মিক সন্তানের মৃত্যুতে অনুরূপ দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে। যারা তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন তাদের জীবিকা পরকালে স্থান্তরিত হলো এবং তাদের সুখও পরকালে চলে গেল। এমনকি একশত বৎসর পরও তারা কখনো এ দৃশ্য ভুলবে না যখন খোদার নবী তাদের মাঝে হেঁটে বেড়িয়েছিলেন।

জামাতের ঐ সকল সদস্য যারা প্রতিশ্রুত মসীহকে গভীরভাবে ভালবাসতেন এবং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নিষ্ঠাবান ছিলেন তারা তাদের দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করে সর্বক্ষণের জন্যে কখনো বিশৃংখলা প্রদর্শন করেন নি, বরং তারা অত্যন্ত মর্যাদার সাথে নিজেদের ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ করেন। বিরুদ্ধবাদীরাও প্রতিশ্রুত মসীহের মরদেহ দেখতে এসেছিল। কিন্তু তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

প্রতিশ্রুত মসীহের পরিবারের সদস্যগণ চরম সংযম ও ধৈর্য প্রদর্শন করেন। তাদের আচরণ ছিল অসাধারণ মর্যাদাপূর্ণ। ইতিহাসে এর কোন নজির নেই। এরূপ ঘটনার পর সাধারণতঃ যেরূপ হৈ চৈ হয় তার মধ্যেও প্রতিশ্রুত মসীহের স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন সম্পূর্ণরূপে শান্ত ছিলেন এবং

প্রতিশ্রুত মসীহ্ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত সর্বক্ষণ দোয়ায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি কেবল "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন" উচ্চারণ করেন। অতঃপর তিনি হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলেন।

এ সময় কয়েকজন মহিলা উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করেন। কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন কঠোরভাবে তাদেরকে থামিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে সাবধান করে বল্লেন,"তিনি আমার স্বামী ছিলেন। আমি কাঁদছি না। তোমরা কেন কাঁদছ ?" ইহা একজন ধার্মিক মহিলার চূড়ান্ত সংযমের পরিচয়, যিনি প্রভূত সাহস দেখিয়েছেন, যিনি আরাম-আয়াশের পরিবেশে বড় হয়েছিলেন এবং যাঁর আশীষপ্রাপ্ত স্বামী ও আধ্যাত্মিক বাদশা এইমাত্র ইন্তেকাল করলেন। কেবলমাত্র উম্মুল মু'মিনীনই নয়, একটু পরে তাঁর সকল সন্তান এসে প্রতিশ্রুত মসীহের চারদিকে একত্রিত হলেন। তিনি তাদের সকলকে উপদেশ দিয়ে বলেন ঃ

"সন্তানেরা, কেবল তোমাদের গৃহ জাগতিক সম্পদশূন্য বলে তোমরা কখনো ভেবো না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের জন্যে কিছু রেখে যান নি। তিনি তোমাদের জন্যে দোয়ার বড় সম্পদ রেখে গেছেন এবং যথাসময়ে তোমরা তোমাদের অংশ পেতে থাকবে।"

"প্রতিশ্রুত মসীহের মৃত্যুর পর যখন তাঁর পবিত্র দেহ বাটালা হতে কাদিয়ান বয়ে আনা হচ্ছিল তখন যে দলে উম্মুল মু'মিনীন ছিলেন আমাকে (*হযরত ভাইজী -অনুবাদক*) সে দলে থাকার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল (এই দলে প্রতিশ্রুত মসীহের পরিবারের আরো দুই একজন মহিলাও ছিলেন)। উম্মুল মু'মিনীন নীরবে দোয়ায় রত ছিলেন এবং সাহস ও ধৈর্যের মহান দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছিলেন। দলটি যখন ক্যানাল ব্রীজে পৌছল তখন গভীর শোকার্ত কণ্ঠে উম্মুল মু'মিনীন বল্লেন, ভাইজী ২৫ বৎসর পূর্বে এক নববিবাহিতা বধুরূপে আমি এ স্থান অতিক্রম করেছিলাম এবং আজ আমি এক বিধবারূপে এ স্থান অতিক্রম করছি" *(আসহাবে আহমদ, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭৫)*।

সাহেবযাদা মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (খলীফাতুল মসীহ সানী) প্রতিশ্রুত মসীহের মরদেহের পাশে দাঁড়ালেন এবং ঘোষণা করলেন ঃ "এমনকি যদি সকলে আপনাকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং আমাকে একলা রেখে চলে যায়, তথাপি আমি সারা বিশ্বের মোকাবেলা করবো এবং কখনও দুঃখ-কষ্ট ও বিরোধিতার পরোয়া করবো না।"

হযরত মৌলবী নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ নির্বাচিত হওয়ার পর প্রায় ১২০০ ব্যক্তি তাঁর হাতে বয়াত হন। হুযূর কূপের নিকট অবস্থিত মির্যা সুলতান আহমদের বাগানে জানাযা পড়ান। আসর নামাযের পর লোকেরা প্রতিশ্রুত মসীহের স্বর্গীয় দেহ দেখার শেষ সুযোগ পেয়েছিলেন। এ ব্যবস্থাটি করেছিলেন ভাই আব্দুর রহমান কাদিয়ানী। এ সম্মান তাঁরই জন্যে রাখা হয়েছিল। লাহোর থেকে যে চারপাইটি আনা হয়েছিল মরদেহ তাতেই রাখা হয়েছিল। হযরত ভাই সাহেব চারপাই-এর উত্তরে প্রতিশ্রুত মসীহের পবিত্র শিয়রের নিকটে মাটিতে বসেছিলেন। প্রথমে পুরুষরা পরে মহিলারা দেখতে আসেন। লোকেরা আঙ্গিণা থেকে দেয়ালের পশ্চিম পাশের দক্ষিণ দূয়ার দিয়ে প্রবেশ করে এবং উত্তর দূয়ার দিয়ে বেরিয়ে যায়। হুযূরের দেহ সম্পূর্ণ স্বর্গীয় জ্যোতিতে আচ্ছাদিত ছিল। এর উপর গরমের কোন প্রভাবই ছিল না।

উম্মুল মু'মিনীন আঙ্গিণার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে মহিলাদের সঙ্গে ছিলেন। লোকেরা প্রতিশ্রুত মসীহের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর তাঁর পবিত্র দেহ দাফন করার জন্যে পূর্বদিকের দরজা দিয়ে বের করে আনা হয়। ১৯০৮ সালের ২৭শে মে সন্ধ্যা প্রায় ৬ ঘটিকায় অশ্রুসিক্ত ও শোকসন্তপ্ত শত শত লোকের উপস্থিতিতে পবিত্রদেহ সমাহিত করা হয়। দাফনের সময় নিরাপত্তার জন্যে এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাযী আব্দুর রহিম ভাট্টি একটি ইটের তোরণ নির্মাণ করেন। যখন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল ব্যাপারটি জানতে পারেন তিনি তা পসন্দ করেন নি। কারণ তখন অন্ধকার হয়ে আসছিল এবং ঘন বৃক্ষরাজির দরুন অন্ধকার আরো গভীর হয়ে গিয়েছিল। তখন কাযী সাহেব ইট নির্মিত তোরণ সরিয়ে ফেলেন *(আসহাবে আহমদ, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৭)*।

হুযূরের কবর মাটি দিয়ে ভরিয়ে দেয়া হয়। প্রথম দিকে পরিচিতির উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুত মসীহের শিয়রের দিকে লেখা হয়েছিলঃ মির্যা গোলাম আহমদ, নবী, মাহদী ও ১৪০০ হিজরীর সংস্কারক। মৃত্যুর তারিখ ২৬ শে মে, ১৯০৮ ইং"। পরবর্তী সময় একটি মার্বেল স্ল্যাব লাগিয়ে দেয়া হয়। নিরাপত্তার খাতিরে ১৯২৫ সালের নভেম্বরে বিশেষ স্থানটির চতুর্দিকের বর্তমান প্রাচীরটি নির্মাণ করা হয়।

"ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য বটে ; কিন্তু স্থায়ী সংকর্মসমূহ তোমার প্রতিপালকের দৃষ্টিতে পুরস্কারের দিক দিয়েও উৎকৃষ্টতার এবং (ভবিষ্যৎ) আশার দিক দিয়েও উৎকৃষ্টতর" (সূরা কাহ্ফ-আয়াত ৪৭)।

গ্রন্থকারের কথা

আমার বয়স যখন ৫ বা ৬ বৎসর তখন আমি প্রথম কাদিয়ান যাই। ১৯৪০ বা ৪১ সালের কোন এক সময় বরযাত্রীর সাথে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। আমার স্মরণ আছে খলীফাতুল মসীহ্ সানীও ঐ বিয়েতে এসেছিলেন। আমার স্মরণ আছে তিনি মেঝেতে বসেছিলেন। আমি মেহমানদের মাঝে দৌড়া-দৌড়ি করছিলাম। তিনি আমাকে ধরে ফেল্লেন এবং তাঁর কোলে বসালেন। তিনি জানতে চাইলেন এই ছেলেটি কে ? কোন এক ব্যক্তি উত্তর দিলেন যে, আমি বরের ছোট ভাই। আমার স্মরণ আছে একদিন ফজরের নামাযের পর আমার পিতা আমাদেরকে বেহেশ্তী মকবেরা সংলগ্ন আম বাগানে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাদেরকে লাল রং এর টাইলস দ্বারা শোভিত উঁচু বসার স্থানটিতে দেখালেন, যেখানে প্রাতঃভ্রমণের পর প্রতিশ্রুত বসে আরাম করতেন। আমরা শিশুরা ছুটা-ছুটি করে ঐ শোভিত উঁচু স্থানে বস্তাম এবং প্রত্যেকে দাবী করতাম যে, আমি ঐ জায়গাতেই বসেছি যেখানে প্রতিশ্রুত মসীহ্ বসতেন।

আমি দ্বিতীয়বার কাদিয়ান যাই ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে। সে যাত্রায় আমি সেখানে মাত্র এক রাত্রি ছিলাম। মিঞা ওয়াসীম আহমদ সাহেব অনুগ্রহ করে আমাকে বাইতুল ফিকিরে ঘুমাতে দিলেন যাতে করে আমি বাইতুদ দোয়ায় গিয়ে দোয়া করার সুযোগ লাভ করতে পারি।

১৯৮৮ সালে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) আহমদীয়া মহল্লা ও দারুল মসীহ্-এ অবস্থিত যে সকল দালান কোঠা নষ্ট হওয়ার পথে সেগুলো দেখার জন্যে তাঁর বিশেষ প্রতিনিধিরূপে আমাকে কাদিয়ানে পাঠান। ঐ সময়েই আমি বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পবিত্র স্থান চিহ্নিত করার ব্যাপারে আগ্রহী হই। কাদিয়ানের বিভিন্ন অংশে প্রায় তিন বৎসর কাজ করার পর জামাতের সদস্যগণের উপকারার্থে এ সকল তথ্য জড়ো করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

আব্দুর রশিদ

চাটার্ড আর্কিটেক্ট এন্ড টাউন প্লানার চেয়ারম্যান, ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব আহমদী আর্কিটেকটস্ এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (ইউরোপিয়ান চ্যাপটার) আর্কিটেকচারাল এ্যাডভাইজার টু খলীফাতুল মসীহ্ রাবে'। (সমাপ্ত)

অনুবাদ- নজির আহমদ ভূঁইয়া

"সকলের জন্যে ভালবাসা, কারো জন্যে নয় ঘৃণা"
--খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)

উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ

(৩২তম কিস্তি)

পরিখা যুদ্ধোত্তর সময়ে ঃ

পরিখা যুদ্ধের ব্যর্থতা কাফেরদের মাঝে নিরুৎসাহ সৃষ্টি করলেও বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে তারা ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করতে পারবেই, তাদের মনে এ মানসিকতা কাজ করতে থাকে। এজন্য তারা মুসলমানদেরকে যেখানে একলা-দোকলা পাবে তাদেরকে হত্যা করার নীতি গ্রহণ করে। তাছাড়া যুদ্ধ বিপর্যয়ের কিছু দিন পরেই আশে-পাশের কবিলাগুলো মুসলমানদের উপর চোরাগোপ্তা হামলা চালাতে শুরু করে। এ অবস্থায় কিছু লোক উটেচড়ে একবার মদীনার নিকটে আক্রমণ করে মুসলমানদের উটের রাখালকে হত্যা করে, তার স্ত্রীকে বন্দী করে ও তাদের সব উট ধরে নিয়ে যায়। পরে বন্দী স্ত্রীলোকটি কোনক্রমে পালিয়ে আসে। এর একমাস পরে উত্তর দিক থেকে গোৎফান গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের উটের পাল লুটে নেয়ার চেষ্টা করে। এ অবস্থায় আঁ হযরত (সঃ) মুহাম্মদ বিন মুসাল্লামা (রাঃ)-কে দশজন আরোহী সেনা সহ ঘটনা তদন্ত ও মুসলমানদের পশুর পালগুলোকে পাহারা দেয়ার জন্য পাঠান। শত্রুরা সুযোগ পেয়ে তাদেরকে হত্যা করে। আহত ও অজ্ঞান মুহাম্মদ বিন মুসাল্লাম (রাঃ)-কে তারা মৃত মনে করে ফেলে যায়। শত্রুরা চলে গেলে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। তিনি মদীনায় ফিরে এসে সব ঘটনা জানান। কিছুদিন পর হযরত (সঃ)-এর একজন দূতের উপরেও, যাঁকে রোমান সরকারের নিকটে পাঠানো হয়েছিলো-যুরহাম গোত্রের লোকেরা হামলা চালায় ও তার সবকিছু লুটে নেয়। এর মাস খানেক পরে বনু কোরায়যার লোকেরা মুসলমানদের একটি কাফেলার উপর আক্রমণ চালায় ও লুট করে। অনেকে মনে করেন এই হামলা কোন ধর্মীয় কারণে নয়; বরং তা ছিলো ডাকাতি মাত্র। এসময়ে খায়বারের ইহুদীরাও আশে পাশের কবিলাগুলোকে উস্কানী দিচ্ছিল। পরিখার যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে তারা রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তে বসবাসকারী উপজাতীয় লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। আরব নেতারাও এতে ইন্ধন যোগাচ্ছিল। অপরদিকে নবী করীম (সঃ) এ আশাই পোষণ করছিলেন যে, আরব নেতারা হয়তোবা সন্ধির প্রস্তাব দিবে, যার ফলে গৃহযুদ্ধের অবসান হবে আত্মীয়-স্বজনের রক্তের হোলি খেলা রুদ্ধ হবে।

প্রায় দেড় হাজার সাথীসহ হুযূর (সঃ)-এর মক্কা যাত্রা ঃ

এই সময়টাতে হযূর (সঃ) একটি রূইয়া তথা সত্য-স্বপ্ন দেখেন। এ রূইয়ার বর্ণনা কুরআন শরীফে এভাবে এসেছে। ৪৮নং সূরার (ফাত্হ) এর ২৮ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন (তর্জমা) 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিয়াছেন, আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিবে নিরাপদে কেহ কেহ মস্তক মন্ডিত করিবে, কেহ কেহ কেশ কর্তন করিবে। তোমাদিগের কোন ভয় থাকিবে না। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যাহা জান না। ইহা ছাড়াও তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন এক সদ্য বিজয়।

এই স্বপ্নে শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত মক্কা বিজয়ের খবর দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু হুযূর (সঃ) ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, আল্লাহ্তাআলা সত্বর তাঁকে ও মুসলমানদেরকে কা'বা ঘর তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করার নির্দেশ দান করেছেন। এই ব্যাখ্যা সঠিক ছিল না। উল্লেখ্য যে, একমাত্র আল্লাহ্ই ভুলের অতীত। নবী-রসূলগণ যতই বড় হউন না কেন, তাঁরাও মানবিক ভুল-ভ্রান্তির উর্দ্ধে নন। এর চাক্ষুষ প্রমাণ হলো শ্রেষ্ঠতম নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-ও ভুল করলেন এবং তা স্বীকারও করলেন। কেননা, তাঁরাও যে মানুষ।

তিনি মক্কা যাওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। তিনি সাহাবীগণকে সঙ্গে যাওয়ার জন্যও বল্লেন। তিনি এ-ও বল্লেন যে, আমরা শুধু তাওয়াফ করার উদ্দেশ্যেই যাব। আমরা এমন কিছুই করবো না, যা শত্রুদের অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে।

হিজরী ষষ্ঠ বৎসরে তথা ৬২৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে প্রায় পনর শ' সাথীসহ তিনি মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। হজ্জের কাফেলার কিছুদূর আগে থেকে অগ্রবর্তী দল হিসেবে কুড়ি জনের একটি দল যাচ্ছিল। উদ্দেশ্য, প্রতিপক্ষ মুসলমানদের কোন ক্ষতি করতে চাইলে তা পূর্ব হতে অবহিত হওয়া যায়। যখন মক্কাবাসীরা হুযূর (সঃ)-এর আগমনের কথা জানতে পারলো তখন তারা মক্কা শহরকে একটা কেল্লায় পরিণত করে ফেল্লো। তারা আশে-পাশের কবিলাগুলোকেও তাদেরকে সাহায্য করার আহ্বান জানায়। যদিও তারা এই ধর্ম-বিশ্বাস পোষণ করতো যে, কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সময় কাকেও বাধা দেয়া যায় না । অথচ মুসলমানেরা ঘোষণায় জানিয়ে দিলো যে, তারা শুধু তাওয়াফের জন্যই এসেছে। মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে হুযূর (সঃ) জানতে পান যে, কোরাইশরা চিতাবাঘের চামড়া পরিধান করেছে। তারা বিবি-বাচ্চাদেরকেও সঙ্গে নিয়েছে। তারা কসমও খেয়েছে যে, তারা কিছুতেই রসূল করীম (সঃ)-কে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। আরবদের একটা প্রথা ছিলো যে, যখন কোন গোত্র মৃত্যুকে বরণ করতে প্রস্তুত হতো তখন তারা চিতা বাঘের চামড়া পরতো। যার অর্থ এই ছিলো যে, যুদ্ধ ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। এ অবস্থাতেই মক্কার সেনাবাহিনীর একটি অগ্রবর্তী দল মুসলমানদের বাধা দানের জন্য মুখোমুখী এসে দাঁড়ালো। এ পরিবেশে মুসলমানদের পক্ষে অগ্রসর হতে হলে যুদ্ধ করে জয়ী হতে হবে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ঃ

মরুভূমিতে রাস্তা দেখানোর জন্য যে পথপ্রদর্শককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো সে তাদেরকে নিয়ে মক্কার নিকটবর্তী হুদায়বিয়া নামক স্থানে এসে উপস্থিত হয়। ঐ স্থানে আঁ হযরত (সঃ)-এর উটনী দাঁড়িয়ে গেলো, আর অগ্রসর হতে চাচ্ছিল না। এটাই আল্লাহ্র ইচ্ছা মনে করে তিনি অন্য কোন বাহনের আশ্রয় নেন নি। এখান থেকে মক্কাবাসীদেরকে তাঁর ইচ্ছা জানালেন। এজন্য তাদেরকে যেকোন শর্ত গ্রহণে রাজি আছেন বলে বল্লেন। হুদায়বিয়াতে তাঁরা শিবির স্থাপন করলেন। অচিরেই মক্কার

সেনাবাহিনীর কাছে এ খবর পৌছে যায়। তারা দ্রুত মক্কার নিকটে এসে অবস্থান নেয়। আলোচনার জন্য প্রথমে কুরাইশরা বুদাইল নামক একজন সর্দারকে প্রেরণ করে। হুযূর (সঃ) তাকে জানালেন, 'আমি তো এসেছি শুধু তাওয়াফ করার জন্য তবে মক্কাবাসীরা যদি বাধ্য করে, তা হলে আমাদেরকে যুদ্ধই করতে হবে।' এরপর আসে মক্কার সেনাবাহিনীর কমান্ডার আবূ সুফিয়ানের জামাতা উরওয়া। সে আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে খুব গর্হিত আচরণ করে। সে বল্লো, 'আপনি এসব ইতর ছোট লোক বাচ্চাদের নিয়ে এসেছেন। এদেরকে মক্কাবাসীরা কখনই তাদের শহরে প্রবেশ করতে দিবে না।' এভাবে একের পর এক বার্তাবাহক আসতে থাকে, নানা কথা বলতে থাকে। অবশেষে মক্কাবাসীরা বলে পাঠালো, আর যাই হোক এ বছর আপনাকে আমরা তাওয়াফ করতে দেব না। কেননা, এতে আমরা অপদস্থ হবো। তবে আপনি আগামী বছরে আসেন। তাহলে আমরা আপনাকে অনুমতি দেবো।'

মক্কাবাসীদের এরূপ আচরণে পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। তারা বলতে লাগলো, 'এরাতো এসেছে শুধু তাওয়াফ করার জন্য। আপনারা এদেরকে বাধা দিচ্ছেন কেন ?' কিন্তু মক্কাবাসীরা কিছুতেই তাদের জিদ ছাড়লো না। তারা বুঝলো না-এতে হুযূর (সঃ)-কে আবারও মক্কায় আসার সুযোগ করে দিচ্ছে তারাই।

বয়আতে রিজওয়ান ঃ

যা হোক রক্তপাত পরিহার করা এবং কাফেলার উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অবহিত করার জন্য আঁ হযরত (সঃ) হযরত উসমান (রাঃ)-কে দূতস্বরূপ মক্কায় পাঠান। কুরাইশরা ইহাকে মুসলমানদের দুর্বলতা বলে গণ্য করলো। কয়েকদিন গত হয়ে গেলো হযরত উসমান (রাঃ) মক্কা হতে ফিরছেন না। এ সময়ে হঠাৎ জোর প্রচার হলো যে, কুরাইশরা হযরত উসমান (রাঃ)-কে হত্যা করেছে। এতে মুসলমানরা কুরাইশদের প্রতি খুবই ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে। এ সংবাদে হুযূর (সঃ)-ও এ হত্যার [দূতকে মেরে ফেলার] প্রতিশোধ গ্রহণকে ফরয বলে ঘোষণা করেন। তিনি একটি বাবলা গাছের নীচে বসে কাফেলার সকলের আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করায় বয়আত নেন। ইহা বয়আতে রিজওয়ান নামে ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। পরে দেখা গেলো হযরত উসমান (রাঃ)-কে হত্যার খবরটি ছিলো নিছক একটি গুজব। ইতোমধ্যে কুরাইশদের নিকট খবর পৌছুলো যে, মুসলমানরা মরণপণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এতে বিচলিত হয়ে কুরাইশরা সোহেল ইবনে আমর নামক একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে কয়েকজন সাথীসহ হুযূর (সঃ)-এর সাথে সন্ধিচুক্তি আলোচনার জন্য প্রেরণ করে। দীর্ঘ বাদানুবাদ ও আলোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত শর্তে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয় ঃ

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শুরু করছি।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ এবং সোহায়েল ইবনে আমর (মক্কা প্রশাসনের প্রতিনিধি)-এর মধ্যে সম্পাদিত এই শান্তিচুক্তির শর্তাবলী হচ্ছে ঃ

১। দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করা হলো।

২। মুসলমানগণ এ বৎসর হুদায়বিয়া হতে ফিরে যাবেন।

৩। আগামী বৎসর তারা তাওয়াফ করতে আসতে পারবেন। কিন্তু তিনদিনের বেশী মক্কায় থাকতে পারবেন না।

৪। পথচলার আবশ্যক মতো অস্ত্র নিয়ে মুসলমানরা আসতে পারবেন। তবে তা-ও থলিয়ার মধ্যে আবদ্ধ রেখে আসতে হবে।

৫। মক্কায় যে সকল মুসলমান আছেন, তাদের মদীনায় নিয়ে যেতে দেয়া হবে না। তাঁর [হুযূর (সঃ)-এর] সঙ্গীদের মধ্যে কেউ যদি মক্কায় থেকে যেতে চায়, তিনি তাকে বারণ করতে পারবেন না।

৬। কাফের অথবা মুসলমানদের মধ্যে কেউ মক্কা হতে মদীনায় গেলে তাকে ফেরৎ দিতে হবে। অপরদিকে কোন মুসলমান মক্কায় আসলে তাকে ফেরৎ দেয়া হবে না।

৭। আরবের অন্য গোত্রগুলো স্বেচ্ছায় যে কোন পক্ষের সাথে মিত্রতা স্থাপনের অধিকারী থাকবে।

আপাতদৃষ্টিতে সন্ধির বেশ কিছু শর্ত মুসলমানদের জন্য পরাজয়সূচক ও হেয়তাপূর্ণ মনে হয়। এমনকি হযরত আবূ বকর (রাঃ) ছাড়া বিশিষ্ট সাহাবাগণও এরূপ চুক্তিতে ঘোর আপত্তি জানান। কিন্তু হুযূর (সঃ) ছিলেন এতে অনড়। তিনি চেয়েছিলেন রক্তপাত রোধ করতে এবং মুসলমানদের জন্য মক্কায় হজ্জ ও ওমরাহ পালনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। তাতে এক বৎসর বিলম্বে তেমন কিছু যায় আসে না। বস্তুতঃ লক্ষ্য অর্জনে তিনি পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন।

এই চুক্তিই ইতিহাসে 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। হুযূর (সঃ) এই চুক্তির শর্তগুলো পালনের বাস্তব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তখন মনে হচ্ছিল যে, মুসলমানেরা ঠগে যাচ্ছে। আসলে এগুলো ইসলামকে দৃঢ়মূল করেছে। অশান্তির পরিবেশে শান্তির বায়ু প্রবাহিত করেছে। এ চুক্তি সম্পর্কে পরবর্তীতে ইসলাম বিরোধি কোন কোন পন্ডিতও হুযূর (সঃ)-এর দুরদৃষ্টি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। এ সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশরা যে পরোক্ষভাবে মুসলমানদেরকে একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে তা অনুধাবনই করতে পারে নি। কুরাইশরা যদি তাওয়াফে বাধা সৃষ্টি না করতো তবে প্রথা হিসেবে মুসলমানরা তাওয়াফ করে গেছে এ নিয়ে হয়তো কিছু দিন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই বিষয়টি শেষ হয়ে যেতো। কুরাইশদের পক্ষ থেকে প্রথমে চরম বাধা সৃষ্টি ও পরে সন্ধির আশ্রয় নেয়া বিষয়টিকে অযথা অসাধারণ করে তুলে। সন্ধির কারণে বলতে গেলে দেশব্যাপী শান্তির একটি পরিবেশ সৃষ্টি হলো তাতে অনেকেই ইসলামকে বুঝার সময় ও সুযোগ পেলো। প্রায়ই দেখা যায় হানাহানি মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। শান্ত পরিবেশ ওগুলোকে জাগ্রত ও সক্রিয় করে তোলে। (চলবে)

– মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ধর্মের মর্মকথা

কেউ কেউ এই বলে বিষোদগার করেন যে, আন্তঃদেশীয় বৈরিতা ও বিগ্রহ-বিতন্ডার মুখ্য কারণ হচ্ছে ধর্ম অর্থাৎ ধর্মের বিভিন্নতা ও বিবিধ ধর্মের অনুশাসন-জটিলতা। যার কারণেই সৃষ্ট হচ্ছে না বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের স্নেহ-বন্ধন ও অকৃত্রিম ভালবাসা। ফলশ্রুতিতে আমরা অবলীলায় জড়িয়ে পড়ছি অপরের শুভ বিনাশ ষড়যন্ত্রে আর যুদ্ধ সাধন চেষ্টার খেলায়। তথাকথিত বিজ্ঞ ধর্ম বিশ্লেষণগণের অজ্ঞ মতামত অনেকটা এইরূপ।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বিশ্লেষকগণের চলন-বলন, লিখন-শিখন, আচার-আচরণ এবং শাসন-ভাষণসমূহ মানবাদর্শ আয়নার নিরীখে পরখ করলে প্রতিভাত হয় না যে, বর্তমানে তারা কেউ ধর্মের অনুশাসন লেশমাত্র অনুকরণপূর্বক দিন গুজরান করেন। মূলকথা হচ্ছে, ধর্ম-নিন্দুক মহাশয়গণ আজ পৃথিবীর তাবৎ অশুভ কান্ডের দায়িত্বভার ধর্মের কাঁধে ন্যস্ত করে আসলে তারা নিজেদেরকে আদর্শবান হওয়ার কর্তব্য থেকে পরিত্রাণ লাভের পাঁয়তারা করছেন। আর চটকদার বাক্য আস্ফালনে বহুজনের হাততালি উপার্জনের প্রয়াস করছেন।

পাঠক! আমার আলোচনার বিস্তৃতিতে প্রবেশের পূর্বে নেহায়েৎ সংক্ষিপ্তভাবে উক্ত করে রাখছি যে, আসলে ধর্ম হলো খোদাপ্রদত্ত কতিপয় নির্দেশনা যা অবলম্বনে মানুষে-মানুষে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্র গড়ে উঠে এবং পরবর্তীতে তার দ্বারা সেই পরম শান্তি দাতার সকাশে পৌছে আত্মা এতমিনান লাভ করে। মূলতঃ ইহাই হলো ধর্মের মর্মকথা। কোন ধর্মাবতারই ধর্মের নামে এই শাশ্বত বাণীর বিপরীত কোন শিক্ষা প্রচার করতে পারেন নি এবং করেনও নি। কারণ এর উল্টো কোন কোন শিক্ষাকে ধর্ম বলে আখ্যায়িত করা যায় না এবং বিলক্ষণ তা কল্যাণকর হতে পারে না। তা হলে সত্য দাঁড়াল এই যে, ধর্ম মূলতঃ এক এবং অভিন্ন। যিনি "বিভিন্নতা" শব্দ সংযোজনে ধর্মের ওপর এলযাম এনে ধর্মকে লাঞ্ছিত করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন তিনি আসলে মানব-প্রেম ও শান্তি ভঙ্গের শিরোমণি, জঞ্জাল সৃষ্টির অগ্রদূত। তিনি অস্বচ্ছ পানিতে মৎস্য শিকার করতে প্রয়াসী। যদি ব্যাপারটাকে একটু প্রসারিতভাবে উপস্থাপন করি তবে উহার সত্যতা উজ্জ্বলভাবে প্রতীয়মান হবে।

বিজ্ঞানের গবেষণা ও ধর্মের তত্ত্ব বিশ্লেষণে আজ স্পষ্টতই এই সত্য দীপ্ত হয়েছে যে, ধর্মাগমনের বহু লক্ষ বছর পূর্বেই পৃথিবীতে মানব-সত্তার জন্ম লাভ ঘটেছে। সেই মানুষ সেদিন হতে স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও ধ্যান-ধারণাজ্ঞানে সাতিশয় নিম্নমানের চরিত্র মহত্বে পৃথিবীতে বিচরণ করে আসছিল। আহার-পরিধান, মানস-কামনা, সামাজিক বন্ধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের বিন্দুবৎ উৎকর্ষতা ছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। এমনিভাবে মানব সৃষ্টির লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল বটে, তথাপি তারা তাদের জীবন-মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন বিকল্প মহত্বর পথ প্রাপ্তির সন্ধান সাধন করতে পারল না। অতএব কারণেই সেদিনকার সেই মানুষ মোটামোটিভাবে তার প্রিয় স্রষ্টার সাথে আধ্যাত্মিক বন্ধনবিহীন অবস্থায়ই জীবনকাল চালিয়ে আসছিল। তবে তাদের পবিত্রাত্মা সদা-সর্বদাই কোন এক মহিমায় সত্তার সান্নিধ্য প্রাপ্তির ঈপ্সিত কামনায় উদ্বেল পিপাসার্ত ছিল। কারণ মানবাত্মায় প্রোথিত পুণ্যময় অস্তিত্বের ইহা এক অনন্য এবং বেনজীর বৈশিষ্ট্য। খোদার প্রেমার্জন ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নয়ন সাধনের আকাংখাই হলো মানুষের সাথে খোদার আর সব এন্তার সৃষ্টির উল্লেখযোগ্য পার্থক্য। সেই বৈশিষ্ট্যের তাড়নায় তাড়িত হয়ে যখন সেদিনকার সেই ভবঘুরে মানুষ পরম সত্তার প্রাপ্তির প্রয়াসে বিচলিত হয়ে উঠল তখনই পরম দাতা ও দয়ালু খোদা মর্তবাসীর সমীপে তাঁর তরফ থেকে প্রভূত প্রজ্ঞা ও কল্যাণভান্ড দিয়ে আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত প্রতিনিধি প্রেরণ করতে শুরু করলেন। আর সেই ধারা জাতিতে জাতিতে প্রবাহমান হতে থাকল বহুকালব্যাপী। এই পবিত্র প্রতিনিধিগণ পৃথিবীতে আগমনপূর্বক মানুষকে খোদার ফয়েয সন্ধান লাভের যে নেকের পথ বাত্‌লিয়েছেন তাকেই বলে ধর্ম। মূলতঃ মানবাত্মার আর্তনাদ ও পিপাসা উপশমের লাঘবেই পৃথিবীতে ধর্মের আগমন। খোদাতাআলা মানুষের ওপর ধর্মকে বলপূর্বক চাপিয়ে দেন নি। এই উক্তি নিছক অপবাদ। পরন্তু মানুষের শান্তি লিপ্সা নিবারণ নিমিত্তেই ধর্মের আগমন। কাজেই ধম বিশ্ব-মানবে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের ক্ষেত্রে দেয়াল সৃষ্টি করে--এ উক্তি পাগলের প্রলাপ মাত্র। কারণ প্রতিটি ধর্মের মূল শিক্ষাই এক এবং প্রভেদহীন, যদ্বারা কেবলই খোদা প্রাপ্তির সন্ধান মিলে ইহা কখনও মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে না। আসলে আমরা ধর্মের সেই উৎকৃষ্ট মহানুভব আদর্শ থেকে বিচ্ছিন হয়ে পড়েছি বলেই আমাদের মধ্যে যতসব বিসম্বাদ এবং বিড়ম্বনা। তাই স্বধম গোষ্ঠিতেও দ্বন্দের কোন বিরাম নেই। অতএব যারা বলে ধর্মের কারণেই পৃথিবীতে ধ্বংসযজ্ঞের প্রবাহ বইছে, তারা ভুল পথে পরিচালিত। তারা সমাজে কু-প্রভাব বিস্তারকারী ও কুসঙ্গ সৃষ্টিকারী। তারা স্বীয় আত্মার পবিত্রতাকে বিনষ্ট করে ফেলেছে। ফলে তাদের আত্মার অশুভ প্রবৃত্তির কড়াল গ্রাস তাদেরকে বিনাস করতে বসেছে। পৃথিবীর যাবৎ সব অকল্যাণকর পরিস্থিতি সৃষ্টির সর্বাধিনায়ক তারাই। তারা স্বর্গালোকের পথের পথিক নহে। বরং বিজলীর হঠাৎ আলোতে পথ ডিঙ্গাবার ফন্দি আঁটছে। তাই কেবল তাদের দ্বারাই সম্ভব সমাজের ইত্যাকার বিভৎস্য এবং কুৎসিৎ কর্মকান্ডের ইন্ধন সরবরাহ করা এবং তারা তা-ই করছে। তৎপর ধর্মের ওপর দোষ বর্তায়ে নিরঙ্কুশ সাধু সাজার চেষ্টা করছে। মূলত ঃ তারা ধর্মের অনুপম শিক্ষার নিয়ন্ত্রিত আদর্শে নির্মল জীবন যাপনে পক্ষপাতী নয়। তারা বলগাহীন উশৃংখল জীবন পালন করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চায়। ইহা আত্ম প্রবঞ্চনার নামান্তর।

সুতরাং সর্বান্তে নির্মল চিত্তধারীদের উদ্দেশ্যে এই কথাই ব্যক্ত করতে চাই যে, ধর্ম হলো আত্মার ক্ষুধা নিবারণের পবিত্রতম খোরাক এবং চলার পথের জ্যোতিঃ, চিত্তকর্ষক জীবনের অলংকার। সর্ব প্রকার অন্যায় বিভীষণ ও অশুভ অনল নির্বাপণের সর্বোত্তম অবলম্বন। ইহা মানুষকে শুদ্ধি ও সুখময় জীবন গড়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। শুধু মাত্র ধর্মের কল্যাণ দ্বারাই মানুষের অবাধ্য আত্মা শান্তি-প্রাপ্ত আত্মায় পরিণত হয়ে পুণ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মার্গে উপনীত হতে পারে। পক্ষান্তরে, "যে এই সত্যকে উপেক্ষা করিয়াছে সে অকৃতকার্য হইয়াছে" (সূরা আশ্ শাম্‌স)। ধর্মই মানুষকে নূরের তৈরী ফিরিশ্‌তা হতে শ্রেষ্ঠতর করে কারো আত্মাকে তৃতীয়, চতুর্থ ও সপ্তমাকাশে উন্নীত করেছে আবার কাউকে আরশে ইলাহীতে পৌছে দিয়ে 'ফানা ফিল্লাহ্' হতে সহায়তা দান করেছে। তাই বলা যায়, বোকা ধর্ম-বৈরীর মতে ধম জটিলতা নয় বরং কেবল ধর্মের সরলতার দ্বারাই সম্ভব বিশ্বব্যাপী বিরাজমান সকল নিষ্ঠুরতাকে নিঃশেষ করে মানুষে মানুষে প্রেমের বন্ধন সৃষ্টি করা। সুতরাং এই ধর্মের ওপর অপবাদ অর্পণ করে অভিপ্রেত মনস্কামনায় বিজয় লাভ করা বিলক্ষণ অসম্ভব। তাই আসুন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ধর্মের উৎকর্ষতা ও এস্তেকামতকে খুঁজে বের করে আগলে ধরে সসোহাগে লালন ও পালন করি এবং উহাকে পথের পাথেয় করে যাত্রা করি। কেবলমাত্র উহার অনুশাসনের মঙ্গল ইঙ্গিতেই বর্তমান জগত পৃষ্ঠের যাবতীয় কদাচার ও বেদনার পাহাড় জলবৎ তরল হয়ে মৃত্তিকা গর্ভে বিলীন হওয়া সম্ভব। নতুবা আমাদের বুদ্ধির দ্বারা কৃত সকল সাধ্য-সাধনাই নিষ্ফল পর্যবসিত হবে।

আর একটু কথা, যেহেতু ইহাও স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, কখনও কখনও রহমান খোদা অতীব দয়া পরবশ হয়ে মানব কল্যাণার্থে পৃথিবীতে তাঁর মনোনীতজন পাঠিয়ে থাকেন সেহেতু চলুন আজকের এই পৃথিবীর কোথাও এমন ধরনের মহাজনের আগমন হয়েছে কিনা তা-ও অনুসন্ধান করি। যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার বদৌলতে স্বর্গ থেকে আগত এমন কোন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ মিলে যায় তবে জীবনটা খুবই সাফল্যের হবে তা বলাই বাহুল্য।

– মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী

চশমায়ে যমযম

(যমযমের প্রস্রবণ)

বুশরা দাউদ

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক)

(শেষ কিস্তি)

হযরত আব্দুল মুত্তালিবের সাথে কুরায়েশের গোত্রগুলোর এক একজন করে লোক বাহনে চড়ে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা দিলো যেন ঐ যাদুকরণীকে দিয়ে মীমাংসা করাতে পারে। ঐ যুগে যেহেতু শহর আজকালকার মত বড় বিস্তীর্ণ এবং দূর দূর পর্যন্ত বসতি ছিলো না বরং ছোট ছোট জনবসতি ছিলো এবং পথে ভয় ও নির্জনতা ছিলো। ঐ সময়ে তীব্র-গতিসম্পন্ন বাহনও ছিলো না। এজন্যে উটে চড়ে যাতায়াত করা হতো। এজন্যে কখনও কখনও মাসের পরেও কোন যাত্রী দলকে যেতে দেখা যেতো। এ কারণে ঐ রাস্তাটি খুবই নির্জন ছিলো। আর যেভাবে, তোমাদেরকে আগেও বলেছি, আরব একটি মরুভূমি এলাকা। আর মরুভূমিতে পানি পাওয়া দুষ্কর এজন্যে লোকেরা যাতায়াত করার সময়ে সাথে যথেষ্ট পানি নিয়ে নিতো। যদি রাস্তায় পানি শেষ হয়ে যেতো তাহলে খুবই কষ্ট হতো। আরও কখনও কখনও যাত্রীদলগুলো পিপাসায় মারাও যেতো। যখন এ যাত্রীদল হেজায ও সিরিয়ায় মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছালো তখন তাদের পানি শেষ হয়ে গেলো। গরম, পিপাসার প্রচন্ডতা আবার লোকালয় থেকে দূরে- এসব কিছু তাদেরকে ভীতু করে তুল্লো। কিছু লোকের নিকট সামান্য পানি অবশিষ্ট ছিলো। কিন্তু তারা দিতে অস্বীকার করলো এই বলে যে, যদি তোমাদেরকে দিয়ে দিই তাহলে আমাদেরও তোমাদের মত অবস্থা হবে।

হযরত আব্দুল মুত্তালিব যেহেতু কা'বার মুতাওয়াল্লী (অভিভাবক) ছিলেন এজন্যে তাঁকে সম্মানিত ও নেতাও মান্য করা হতো। আর তিনি সাধারণ নেতা ও সর্দারদের মত ছিলেন না যে, কেবল নিজের কথাই মান্য করাবেন বরং তাঁর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, নিজের লোকদের সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ-কষ্ট তিনি অনুভব করতেন। ঐ সময়ও তাঁর নিজ জাতির এই লোকদের জন্যে দুঃখ হলো। যাদের কাছে পানি ছিলো তারা দিতে অস্বীকার করলো। সাথে সাথে অন্য লোকদের মারা যাওয়ার চিন্তাও তাঁর মনে জাগলো। কিন্তু করবেন কী ?

তিনি সকলের সাথে পরামর্শ করলেন। তারা তখন বল্লো, আপনি যে সিদ্ধান্ত দিবেন আমরা তা মেনে নেবো। এর পরে তিনি বল্লেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জন্যে একটি কবর খনন করুক, যখন তার মৃত্যু আসে তার সঙ্গীরা তাকে উহার মধ্যে সমাহিত করুক। এভাবে সে শকুন-চিলের খাবার হওয়া থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত হবে। এমন কি শেষ পর্যন্ত একজন বেঁচে যাবে। সেক্ষেত্রে সকলের মরণের চেয়ে কোন একজনের বেঁচে যাওয়া শ্রেয়ঃ। নচেৎ তাদের লাশ মরুভূমিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে। সুতরাং সবাই তাঁর কথা মেনে নিয়ে নিজ নিজ কবর রচনা করলো এবং উহার কিনারায় বসে মৃত্যুর প্রহর গুণতে লাগলো। পিপাসা ও মৃত্যু-ভয়ে তাদের করুণ অবস্থা হলো। তাদের কিছু চিন্তা করার সাহসই ছিলো না। তারা জীবনের ওপরে নিরাশ হয়ে গেলো।

হযরত আব্দুল মুত্তালিব যখন জাতির এহেন দুর্দশা অবলোকন করলেন, তিনি খুবই দুঃখ পেলেন। তিনি কুরায়েশের লোকদের উৎসাহ যোগাতে চাইলেন এবং বল্লেন, 'উঠো, সামনে এগিয়ে চলো সম্ভবতঃ কোন জনপদ মিলে যেতে পারে। সেখানে পানি পাওয়া যাবে। এভাবে নিরাশ হয়ে বসে থাকা ভাল নয়। খোদা সাহায্য করবেন। কিন্তু তারা যেখানে ঘ্যাট হয়ে বসেছিলো সেখানেই বসে থাকলো। কতিপয় লোক তাঁর সাথে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলো। তিনি উঠলেন এবং যখন উটনীর ওপরে আরোহণ করার জন্যে উহাকে উঠালেন তখন খোদার কি মহিমা উহার পায়ের নীচ থেকে মিষ্টি পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত হলো [সীরাতুন্নবী (সঃ), ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড]! ইহা দেখতে পেয়ে তারা বিস্মিত হলো। হযরত আব্দুল মুত্তালিব নিজেও পান করলেন এবং তাঁর সঙ্গীরাও পিপাসা নিবৃত্ত করলো।

আবার তিনি কুরায়েশের লোকদের ডাকলেন এবং বল্লেন, এই দেখো যে, আল্লাহ্‌তাআলা পানি দিয়েছেন। পান করো এবং পরিতৃপ্ত হয়ে যাও। প্রাণ ভরে পান করে নাও। সাথে সাথে যাত্রা পথের জন্যেও নিয়ে নাও। আর দেখো আমার খোদার কী নিদর্শন! এই তাজা নিদর্শন ও খোদার মাহাত্ম্য দেখে কুরায়েশের লোকজন বল্লো, খোদাই মীমাংসা করে দিয়েছেন। হযরত আব্দুল মুত্তালিব বল্লেন, কেমন মীমাংসা ? তারা জবাব দিলো, আপনার পক্ষে রায়। ঐ খোদা প্রমাণ করে দিলেন প্রস্রবণের মালিক আপনি। কেননা, এ মরুভূমিতে পানি দান করা এবং আপনার উটের পায়ের নীচ থেকে পানি বের হওয়া বলে দেয় যে, ঐ পানি আপনার। এভাবে কুরায়েশের সকল গোত্র ঐক্যবদ্ধভাবে যমযম প্রস্রবণে তাঁর অধিকার প্রসঙ্গে স্বীকৃতি প্রদান করলো। কিন্তু ঐ ধন-দৌলত সম্বন্ধে তখনও সিদ্ধান্ত বাকী ছিলো। তখন তারা বল্লো, ঐ ধন-সম্পদ থেকে আমাদের অংশ দিয়ে দিন। হযরত আব্দুল মুত্তালিব বল্লেন, তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য পরীক্ষা করা হবে। ঐ যুগে তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য পরীক্ষা করা হতো।

শোন শিশুরা ! আবার ইহা ঠিক করলো যে, কা'বার নামে দু'টি তীর, দু'টি তীর কুরায়েশে গোত্রগুলোর আর দু'টি তীর হযরত আব্দুল মুত্তালিবের। যে বস্তুর ওপরে যার দু'টি তীর লক্ষ্য ভেদ হবে সে তা-ই পাবে। যার দু'টি তীর লক্ষ্য ভেদ হবে না সে কিছুই পাবে না। তিনি খোদার সন্নিধানে দোয়া করতে থাকলেন। আর তীর নিক্ষেপকারীরা তীর নিক্ষেপে নিজেদের কাজ আরম্ভ করলো। তখন খোদা করলেন কি ! কা'বার নামে দু'টি সোনার হরিণ উঠলো। তলোয়ার ও বর্ম হযরত আব্দুল মুত্তালিবের নামে উঠলো। আর কুরায়েশদের তীর ফাঁকা গেল। আরও একবার খোদা মীমাংসা করে দিলেন যে, জাতীয় সম্পদের অধিকারীও এই পরিবার। যেহেতু তাদের ভবিষ্যতে আমীন ও বিশ্বস্ত হতে হবে তাই। কিন্তু শিশুরা ! হযরত আব্দুল মুত্তালিবও বিশ্বস্ততার চাহিদা পূরণ করেছিলেন। তিনি তরবারীগুলোকে কা'বার দরওয়াজায় নিদর্শনস্বরূপ লাগিয়ে দিলেন। হরিণ দু'টোকে দরজায় খোদাই করে বসিয়ে দিলেন এবং স্বয়ং প্রস্রবণের পানি দ্বারা হাজীদের সেবার দায়িত্ব পালন করতে থাকলেন (ইবনে ইসহাক)।

কথিত আছে যে, এই ছিলো সর্বপ্রথম সোনা যা কিনা কা'বাকে সজ্জিত করার জন্যে ব্যবহৃত হলো। হযরত আব্দুল মুত্তালিব যদি চাইতেন তাহলে সমস্ত ধন-দৌলত নিজের আরাম-আয়াসের জন্যে ব্যয় করতে পারতেন। কিন্তু কা'বা ঘরের ভালবাসা তাঁকে সব কিছু খোদার ঘরে উপহার হিসেবে দিতে বাধ্য করেছে। আর একজন সত্যিকারের বিশ্বস্ত লোকের চিহ্ন এই যে, তিনি স্বয়ং তাঁর নিকট গচ্ছিত সম্পদ যথাস্থানে ব্যয় করেন।

এভাবেই খোদাতাআলা আর একবার এই পবিত্র প্রস্রবণকে প্রবাহিত করে দুনিয়াকে শিক্ষা দিলেন যে, এখন ইহার প্রকৃত মালিকের আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এখন মক্কায় অধিক লোকের সমাগম হবে এজন্যে কোন জাতি যেন পিপাসার্ত না থাকে।

সুতরাং এই প্রস্রবণ (ইবনে ইসহাকের মতে) সারা বিশ্বের কূয়োর ওপরে প্রাধান্য রাখে। এর পানি এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সমস্ত হাজীদের প্রয়োজন পুরো করে থাকে। যেহেতু ইহা মসজিদুল হারামে অবস্থিত ছিলো তাই সকলের পিপাসা এতদ্দ্বারা নিবৃত্ত হতো। আবার ইহা পবিত্রও ছিলো। কেননা, পূত-পবিত্র ও পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ এর প্রবাহিত হওয়ার উপকরণে পরিণত হয়েছে। ইহা গোটা কুরায়েশ ও গোটা আরবের গৌরবের বিষয়। ছিলো তাদের সম্মান ও মাহাত্ম্যের নিদর্শন!

হে কুরায়েশ ! তোমরা তো প্রস্রবণের মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নিয়োছো। এর ওপরে গর্ব করে থাকো। এর মর্যাদার ওপরে কসীদা (প্রশংসা কীর্তন) বলেছো যা এখনও ইতিহাসে রয়েছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে সেই সকল লোকের জন্যে ধিক্কার! যারা এর বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে থাকো। এর অভ্যন্তরীণ নিদর্শন ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল নও। ইহা বুঝতে পারো নি যে, হযরত আব্দুল মুত্তালিব এই প্রস্রবণের খাতিরেই নিজের সবচে' প্রিয় পুত্র আব্দুল্লাহ্‌কে খোদাতাআলার ইচ্ছেনুযায়ী কুরবানী করতে চান। তখন খোদা ঐ কুরবানীকে বাহ্যিক রঙ্গে গ্রহণ করেন নি। বরং আধ্যাত্মিক রঙ্গে আব্দুল্লাহ্‌র কলিজার টুকরো আব্দুল মুত্তালিবের পৌত্র ও আমেনার আদরের দুলালকে সর্বকালের জন্যে স্বীয় প্রিয় ব্যক্তি (সঃ) হিসেবে গ্রহণ করেন।

এ প্রস্রবণের সাথে আরও একটি প্রস্রবণ জারী করেন, যেন এর পরে আর কোন প্রস্রবণের প্রয়োজন না হয়। প্রত্যেক পিপাসার্ত সে পৃথিবীর যে কোন অংশের সাথে সম্পর্ক রাখুক না কেন, যদি তার পিপাসা নিবৃত্ত হতে হয় তাহলে তা মুহাম্মদী (সঃ) প্রস্রবণের শীতল ও সুমিষ্ট পানি দ্বারাই হতে পারে। নচেৎ ঐ পিপাসার্ত মরুভূমিতে পথ হারিয়ে ছট্‌ফট্ করতে থাকে। এমতাবস্থায় সে বনী ইসরাঈলের প্রস্রবণে যায়। কখনও খৃষ্টবাদের কূয়োগুলো তাকে পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্যে আহ্বান জানায়। কখনও মহা ভারতের ডোবা তাকে ডাকে। আর কখনও সমাজবাদের ঝিলগুলো তাকে তাদের বিশ্বাস দেখায়। কখনও বুদ্ধমতাবলম্বী পুকুর ও কখনও অগ্নি উপাসকদের গর্তগুলোতে আবদ্ধ পানি তাকে ডাকে। কিন্তু পান করা সত্ত্বেও পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। তৃষ্ণা বাড়ে এবং বাড়তেই থাকে। যখন উহার আকুতি-মিনতি মরুভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় আর পাহাড়-পর্বতাদির সাথে প্রতিধ্বনিত হয়ে এ প্রস্রবণ অর্থাৎ মুহাম্মদী প্রস্রবণ পর্যন্ত পৌছে তখন এক সুর-মুর্ছণায় এক সংগীত সৃষ্টি হয়ে উহার প্রতিধ্বনি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এই বলে যে, এস ! আর নিজের পিপাসা নিবৃত্তি করো। কেননা, উহা স্বচ্ছ ও মিষ্টি। আর উহা প্রবহমান টলটলে পানি যার মধ্যে কোন মিশ্রণ নেই। একেবারে আয়নার মত স্বচ্ছ। পান করো আর স্বীয় মুখমন্ডল দর্শন করো এবং সাথে সাথে স্বীয় খোদাকেও লাভ করো। তাই শিশুরা! এ যমযম প্রস্রবণটি আমাদের নবী (সঃ)-এর একটি নিদর্শন। তাঁর মাহাত্ম্য, তাঁর মর্যাদা, তাঁর প্রতাপ ও সৌন্দর্যের একটি নিদর্শন। আর ইহা ঐ সময় পর্যন্ত প্রবাহমান থাকবে যখন পর্যন্ত আমাদের নবী সল্লাল্লাহে আলায়হে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক কল্যাণ প্রবহমান থাকবে। আল্লাহুমা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অনুবাদ- **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

সংবাদ

কাদিয়ানের সালানা জলসা-৯৯

বাংলাদেশের আহমদীদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুগ্রহ করে এ বছর পবিত্র রমযানের প্রেক্ষাপটে কাদিয়ানের ১০৮তম সালানা জলসার তারিখ ১৩, ১৪ ও ১৫ই নভেম্বর, ১৯৯৯ রোজ শনি, রবি ও সোমবার অনুষ্ঠানের অনুমোদন দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

জামাতের বন্ধুগণকে ইহা নোট করে নেবার জন্যে, বেশী বেশী অংশ গ্রহণ করার জন্যে এবং কাদিয়ান দারুল আমানের নিদর্শন পূর্ণ জলসার সার্বিক সফলতার জন্যে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

-- **সহকারী সম্পাদক**

শুভ-বিবাহ

গত ২৪-০৭-৯৯ তারিখ মোসাম্মৎ কেশোয়ার সুলতানা (রাসনা) পিতা আব্দুল ওহাব, পূর্ব্ব মেড্ডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এর সহিত জনাব মনিরুজ্জামান ভুঁইয়া পিতা মোহাম্মদ শাহজাহান ভুঁইয়া, গ্রাম ও পোঃ বিষ্ণুপুর, জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর বিবাহ কন্যার পিত্রালয়ে এক লক্ষ তিন টাকা দেন মোহরে সুসম্পন্ন হয়। মোয়াল্লেম মৌঃ মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম বিয়ের এলান করেন। এই বিবাহ বরকতপূর্ণ হওয়ার জন্যে বন্ধুগণের নিকট দোয়ার আবেদন করা হচ্ছে।

আব্দুল কাদের ভূইয়া,
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশ্‌তানাতা

শোক সংবাদ

ইসলামগন্জ জামাতের প্রথম প্রেসিডেন্ট জনাব ফরিদ বখ্‌ত সাহেব গত ২৪/০৭/৯৯ ইং তারিখ রোজ শনিবার (আনুমানিক) ৭০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে ..... রাজেউন)। মৃত্যুর সময় মরহুম তিন পুত্র ও বিধবা স্ত্রী রেখে গেছেন। মরহুম পেশা জীবনে সাংবাদিকতা ও শিক্ষকতা করেছেন। মৃত্যুর সময় তিনি চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে নিজ বাড়ীতেই অবস্থান করছিলেন। মরহুমের রূহের মাগফেরাত ও তাঁর শোকাহত স্ত্রী ও পরিজনের আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক উন্নতির জন্যে আমরা জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর কাছে খাস দোয়া প্রার্থী।

শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন

দোয়ার আবেদন

* আমাদের মাতা বেগম লুৎফুন্নেছা ষ্ট্রোক জাতীয় রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ প্রায় দেড় মাস যাবৎ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩৬নং ওয়ার্ডের ১২১ নং পেয়িং বেডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আমাদের মাতার আশু রোগ মুক্তির জন্যে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তাআলার নিকটে দোয়া করার জন্যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

এ, কে, এম, ইয়াকুব (লিটন)
ধোলাইপাড় বাজার, ঢাকা

* আমি অনেক দিন যাবৎ ডাইবেটিক্‌স রোগে আক্রান্ত হয়ে বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসারত আছি। জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট আমি খাসভাবে দোয়ার জন্যে আবেদন করছি। আল্লাহ্‌তাআলা যেন আমাকে সুস্থ করে ভালভাবে জমাতের খেদমত করার তৌফীক দান করেন।

হোসেন আহমদ, মোয়াল্লেম

দিকে দিকে আজি জ্বলিয়া উঠিছে দীন ইসলামী লাল মশাল

আন্তর্জাতিক বয়াত আরম্ভ হওয়ার পর থেকে সনওয়ারী বয়াতের একটি পরিসংখ্যান দেয়া হলো ঃ

১৯৯৩	২,০৪,৩০৮ জন	১৯৯৭	৩০,০৪,৫৮৪ "
১৯৯৪	৪,১৮,২০৬ "	১৯৯৮	৫০,০৪,০০৬ "
১৯৯৫	৮,৪৫,২৯৪ "	১৯৯৯	১,০৮,২০,২২৬ "
১৯৯৬	১৬,০৬,৭২১ "		

-- **সহকারী সম্পাদক**

সূর্যগ্রহণ ঃ কল্পকাহিনীর ছড়াছড়ি

আজ (১১ আগষ্ট, বুধবার) পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। শতাব্দীর এই শেষ সূর্যগ্রহণ লইয়া বিশ্বব্যাপী মহা আলোড়ন। মানুষের আগ্রহের সীমা নাই। তবে বিজ্ঞানের এই যুগেও বহু লোক সূর্যগ্রহণকে কেন্দ্র করিয়া নানা ধরনের অলীক কাহিনী ছড়াইতেছে। ইহা লইয়া কুসংস্কারেরও অন্ত নাই। যেমন সূর্যগ্রহণের দৃশ্য দেখার জন্য আগ্রহী মানুষের ছুটাছুটি শুরু হইয়া গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অংশে তেমনি শুরু হইয়াছে নানা ধরনের অতিন্দ্রীয়বাদী কল্পকাহিনীর ছড়াছড়ি। ভারতের অতি ইন্দ্রিয়বাদী গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই ঘোষণা দিয়াছে যে, সূর্যগ্রহণের প্রভাবে যুদ্ধ বাঁধিয়া যাইবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ধ্বংস যজ্ঞ শুরু হইবে। বিবিসি'র এক খবরে বলা হইয়াছে, ভারতের হাজার হাজার ধর্মভীরু মানুষ সূর্যগ্রহণের সময়ে পাপমুক্তির জন্য পবিত্র স্নানের প্রস্তুতি নিতেছে। এ উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন পবিত্র মন্দির ও তীর্থ স্থানগুলিতে মানুষ ভিড় জমাইয়াছে। মুম্বাই শহরে ধর্মগুরুরা গর্ভবতী মহিলাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের ঐ সময়ে কোন কাজ না করিয়া ঘরের মধ্যে চুপ-চাপ বসিয়া প্রার্থনা করার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। বহু জ্যোতিষী ঐদিন কোন বিবাহ থাকিলে তাহা স্থগিত করার উপদেশ দিয়াছেন। ভীনু সান্দাল নামের এক বিখ্যাত মহিলা নক্ষত্র গণনাকারী ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পূর্বাভাস দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধ শুরু হইলে তাহা ফেব্রুয়ারী মাসের আগে শেষ হইবে না। তিনি এই সূর্য গ্রহণের মাধ্যমে দৃশ্যপটে কোন না কোনভাবে চীনের আবির্ভাবও দেখিতেছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। ভারতের বহু গ্রামে সূর্যগ্রহণের মাধ্যমে পাপ তাড়াইবার জন্য ধর্মগুরুরা মন্ত্র পড়িতে শুরু করিয়াছেন। অর্জুন মহারাজ নামে এক গুরু মহিলাদের এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, তাহারা যেন ছুড়ি হাতে না নেয়। ছুরি হাতে থাকিলে সূযগ্রহণের সময় মাথা কাটা যাইবে। ভারতের বহু লোকে এখনো বিশ্বাস করে যে, সূর্যগ্রহণ হইতেছে রাহুর গ্রাস। সূর্যগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মহা সর্বনাশের সব সম্ভবনাই থাকিবে।

ভারতের এই সব কুসংস্কারের পাশাপাশি বিজ্ঞানী ও জ্যোতিষীদের তৎপরতাও কম নহে। ভারতের গুজরাটে সূর্যগ্রহণ সবচাইতে ভাল দেখা যাইবে। তাই ৯ হাজারেরও বেশী উৎসাহী মানুষ গুজরাটের ২২টি গ্রামে আসিয়া জড় হইতেছেন আজ। বহু জ্যোতিষীও আসিতেছেন সেই সাথে। গুজরাটে সব হোটেলের কক্ষ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃটিশ পর্যটকরাও ভারতে আসিয়াছেন। ইংল্যান্ডের আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন থাকিতে পারে। তাই তাহারা ভারতকেই সুবিধাজনক স্থান হিসাবে বাছিয়া নিয়াছেন। মুম্বাই শহরের স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরীর দেয়ালে সূর্যগ্রহণের তথ্য দিয়া নানান পোষ্টার শাঁটা হইয়াছে।

ভারতের বাহিরে আলবেনিয়াতে একটি গ্রামের পাঁচটি পরিবারের ৩৪ জন সদস্য সূর্যগ্রহণের ভয়ে বাংকারে আশ্রয় নিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস সূর্যগ্রহণের সময় বড় রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিবে।

ভ্যাটিক্যান সিটিতে পোপ জন পল-২ সূর্যগ্রহণের সময়টিতে তাহার সাপ্তাহিক ধর্মীয় ভাষণ দিবেন।

বাংলাদেশের এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এফ, আর সরকার, সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণের জন্য গুজরাটের ভুজ শহরে গিয়াছেন। ঐ স্থান হইতে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যাইবে।

(দৈনিক ইত্তেফাক ॥ ১১-৮-৯৯)

বিদ্যুৎখাতে জাপান-জার্মানীর ৮ কোটি ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

❑ ৮ জুলাই '৯৯ ॥ জার্মানীর কে এফ ডব্লিউ এবং জাপানের বৈদেশিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা তহবিল বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতে ৮ কোটি মার্কিন ডলার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

চট্টগ্রামে বর্জ্য দিয়ে সার ও বায়োগ্যাস তৈরি প্রকল্প

❑ ১৫ জুলাই '৯৯ ॥ নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় চট্টগ্রামের হালী শহরে বর্জ্য দিয়ে সার ও বায়োগ্যাস তৈরির জন্য 'সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজম্যান্ট প্ল্যাট' স্থাপিত হতে যাচ্ছে।

গেজেটেড কর্মকর্তারা বিনোদন ভাতা ও উৎসব ভাতা উভয়ই পাবেন

❑ ১৫ জুলাই '৯৯ ॥ গতকাল এক সরকারী আদেশে '৮৮-এর জারিকৃত আদেশ তুলে নেয়ায় গেজেটেড পর্যায়ের কর্মকর্তারা এখন থেকে বিনোদন ও উৎসব ভাতা উভয়টিই পাবেন। এ আদেশ ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে।

প্রধানমন্ত্রী পার্ল এস বাক পুরস্কারের জন্যে মনোনীত

❑ ১৫ জুলাই '৯৯ ॥ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সম্মানজনক পার্ল এস বাক '৯৯ পুরস্কারের জন্যে মনোনিত হয়েছেন। গতকাল ওয়াশিংটন থেকে ঢাকায় প্রাপ্ত এক বার্তায় এ সংবাদ পাওয়া গেছে।

আইসিবি ভেঙ্গে ৩টি পৃথক কোম্পানী

❑ ১১ জুলাই '৯৯ ॥ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ভেঙ্গে দিয়ে তিনটি পৃথক সাবসিডিয়ারী কোম্পানী, মার্চেন্ট ব্যাংক, মিউচুয়্যাল ফান্ড ও স্টক ব্রোকার গঠন করা হচ্ছে। এডিবি'র সুপারিশের আলোকে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

রংপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

❑ ২৫ জুলাই '৯৯ ॥ গতকাল সকালে রংপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারে তাঁর সরকার পুরাতন জেলাগুলোতে এ ধরনের ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবে।

বাদশা হাসানের মৃত্যু
নতুন বাদশাহ্ সিদি মোহাম্মদ

❑ ২৫ জুলাই '৯৯ ॥ মরক্কোর বাদশাহ্ দ্বিতীয় হাসান গত শুক্রবার হার্ট এ্যাটাকে রাজধানী রাবাতের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে . . . রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭০ বছর। তাঁর মৃত্যুর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাঁর পুত্র যুবরাজ সিদি মোহাম্মদ নতুন বাদশাহ্ হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর একাডেমী মান প্রশংসনীয় - বিশ্বব্যাংক

❑ ২৮ জুলাই '৯৯ ॥ আর্থিক সংকট সত্ত্বেও একাডেমিক মান বজায় রাখার জন্যে বিশ্ব ব্যাংক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসংশা করেছে।

সংকলন - সরকার মুহাম্মদ মুরাদুজ্জামান

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ
রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার
যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য
যোগাযোগ করুনঃ
সালমান
অস্থায়ী অফিস ঃ
৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43,NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212
TEL : 884724, 872220, 884076,Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."
FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE
FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION
36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG
TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

AHMED TRADE INTERNATIONAL
Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.
Dyer : we have a power dyeing house of our own.
with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944

Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRDUCER OF QALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 62 ❑ 3rd Issue | August 15, 1999 ❑ Tk. 10.00
Fortnightly | The AHMADI | রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

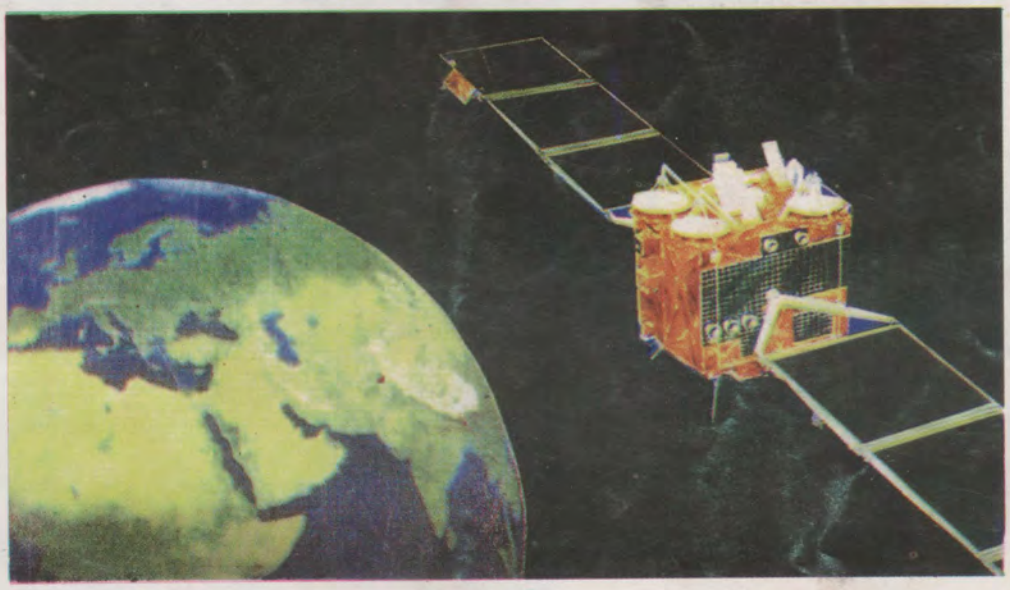

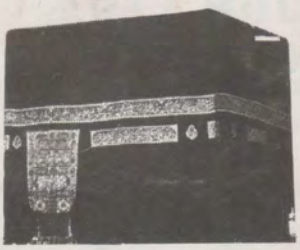

Muslim TV
AHMADIYYA
INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz	* French	: 7.56 MHz
* English	: 7.02 MHz	* German	: 7.74 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz	* Indonesian	: 7.92 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz	* Turkee	: 8.10 MHz

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

এমটিএ অহোরাত্র
দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA-এর নতুন কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গল ও বুধবার কুরআন ক্লাস
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বুধবার বাংলা সার্ভিসে পুরাতন খুতবা প্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- এমটিএ-এর দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ প্রোগ্রামগুলো দেখতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর খুৎবাহ শুনুন।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

আপনার বাড়ীতে এমটিএ MTA -এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 9662703, 505272